

দায়বদ্ধ

DAIBADDHA

A Bengali Novel

By

PRAFULLA ROY

দায়বদ্ধ

প্রফুল্ল রায়

B·P
ভোলানাথ প্রকাশনী
৩৭/১১, বেনিয়াটোলা লেন • কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
সুরেশ দাস
৩৭/১১ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৭২

প্রচ্ছদ শিল্পী :
শচীন বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
যশোদা মাইতি
লিপি মুদ্রণ
৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৬

অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

অনুজপ্রতিমেষু

দায়বদ্ধ



সবে অঘ্রাণ বা অগ্রাণ মাসের শুরু। এর মধ্যেই উত্তর বিহারের এই অঞ্চলটায় শীত পড়ে গেছে। বাতাসে এখন ছুরির ধার। হিমালয় এখান থেকে খুব দূরে নয়। তার বরফ সারা গায়ে মেখে উত্তুরে হাওয়া উল্টোপাল্টা ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে।

এখনও ভাল করে ভোর হয় নি। গাঢ় কুয়াশা এবং অন্ধকারে চরাচর আচ্ছন্ন। চারদিক ঘুমের আরকে ডুবে আছে যেন।

উত্তর বিহারের এক প্রান্তে ধুকুয়া গাঁ। তার শেষ মাথায় অচ্ছুৎটুলি। এখানকার বাসিন্দারা গঞ্জু দোসাদ তাতমা বা গাঙ্গোতা জাতের মানুষ। জাতওয়ারি সওয়াল বা জাতপাতের বিচারে এরা সবাই জল-অচল। এদের ছায়া মাড়ালেও নাকি উচ্চবর্ণের বামহন কায়াথদের দশ বার স্নান করে শুধ্ (শুদ্ধ) হতে হয়।

অচ্ছুৎটুলির বাসিন্দাদের সবাই বড় জমি-মালিক রাজপুত চন্দ্রিকা সিংয়ের বান্ধুয়া কিষাণ অর্থাৎ ভূমিদাস। বাপ, নানা বা তারও আগের কারো ঋণের দায়ে পুরুষানুক্রমে এরা চন্দিকা সিংয়ের জমিতে বেগার দিয়ে যাচ্ছে। এই জনমদাসেরা যদি বিদ্রোহ করে বা বেগার না দিয়ে পালাতে চায়, সে জন্য জমি মালিকের পোষা পহেলবানেরা তাদের কড়া নজরে রাখে। পহেলবানদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে তাদের কিছু করার উপায় নেই।

এই মুহূর্তে অচ্ছুৎটুলির একটি মানুষও জেগে নেই। শুধু কোণের দিকের একটা কোমর-বাঁকা ধসে-পড়া মাটির ঘরে লাল মিট্টি তেলের

ডিবিয়া জ্বলছে। তার আলোতে দেখা যায়, চব্বিশ পঁচিশ বছরের হট্টাকট্টা এক জোয়ান ডোরাকাটা ময়লা পাজামা, পুরনো তালিমারা জামা আর সোয়েটার পরে, সেগুলোর ওপর পোকায়-কাটা ধুসো কম্বল জড়িয়ে নিয়েছে। অঘ্রাণ মাসের মারাত্মক হিম ঠেকানোর পক্ষে এই পোশাক যথেষ্ট নয় কিন্তু কী আর করা যাবে। তাদের মতো ভুখা গরীবদের ঘরে এর বেশি কিছু নেই।

জোয়ান ছেলেটার নাম ধনপত। তার বাপ বুধিরাম আর মা লছিয়াকেও দেখা যাচ্ছে।

মধ্যবয়সী বুধিরামের চেহারাটা ভাঙাচোরা, মুখে খাপচা খাপচা দাড়ি। নিরীহ ভিতু পশুর মতো সে ছেলের দিকে তাকিয়ে আছে। আর লছিয়া একটা বড় কাপড়ের টুকরোয় খানকতক বাজরার রুটি, গোটা কয়েক লিট্টি, খানিকটা মকাই ভাজা, দুটো পুরনো জামা আর পাজামা সযত্নে গুছিয়ে বেঁধে দিচ্ছে। একটু দূরে দেয়ালের ঘা ঘেঁষে ধনপতের তিনটে ছোট ছোট ভাইবোন কম্বল মুড়ি দিয়ে বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে ঘুমোচ্ছে।

বুধিরাম ভয়ে ভয়ে একসময় বলল, 'বহোত ডর লাগতা।'

ধনপত বাপের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কোই ডর নেহি।'

'বড়ে সরকারের পহেলবানেরা তোকে ধরতে পারলে বিলকুল খতম করে দেবে।'

'চিন্তা নায় করনা। পহেলবানেরা আমার চামড়াও ছুঁতে পারবে না।'

বুধিরামের দুর্ভাবনা এবং ভয় তবু কাটে না। সে ভীরু গলায় বলে, 'এখনও সময় আছে, ভেবে ত্যাখ যাবি কিনা।'

ধনপতের মুখ শক্ত হয়ে ওঠে। সে বলে, 'আমি যাবই। জনমভোর বেগার দিয়ে দিয়ে তো মরছিই। এবার কোসিস করে দেখি, বাঁচা যায় কিনা। তুমি আমার মন দুবলা করে দিও না বাপু।'

ব্যাপারটা এইরকম। মা-বাপের সঙ্গে চন্দ্রিকা সিংয়ের ক্ষেতিতে বেগার খাটতে খাটতে কিছুদিন হল মন বেঁকে বসেছে ধনপতের।

সে খবর নিয়ে জেনেছে, বাপের নানা চন্দ্রিকা সিংয়ের নানার কাছ থেকে তিনশ টাকা 'করজ' নিয়েছিল। সেটা সুদে-আসলে কয়েক পুরুষে তিন হাজার টাকায় নাকি দাঁড়িয়েছে। বাপের নানার আমলে তাদের বারো বিঘা পনের ধুর জমি ছিল। ঋণের দায়ে প্রথমে সেই জমিটা চন্দ্রিকারা কেড়ে নেয়, তাতেও ওদের পেট ভরে নি। পুরুষানুক্রমে বেগার খেটে এখন সেই টাকা শোধ করতে হচ্ছে ধনপতদের।

শুধু ধনপতদেরই না, ঋণের দায়ে বা হাজারটা অছিলায় অচ্ছুৎটুলির মানুষদের যার যেটুকু জমিজমা ছিল সব দখল করে নিয়েছে চন্দ্রিকারা। 'করজে'র দায়ে সবাই এখন ভূমিদাস।

ধনপত লেখাপড়া জানে না, সামান্য অক্ষর পরিচয়টুকু পর্যন্ত তার হয় নি। সে পুরোপুরি আনপড়। লিখতে পড়তে না জানলেও তার সহজাত বুদ্ধি তাকে জানিয়ে দিয়েছে, মাত্র তিনশ টাকা 'করজে'র জন্য তিন চার পুরুষ ধরে এভাবে বেগার দিয়ে দিয়ে নিজেদের ধ্বংস করা ঠিক নয়।

সে শুনেছে শহরে গেলে প্রচুর কাজকর্ম পাওয়া যায়। সে সব জায়গায় হাওয়ায় টাকা উড়ছে। মনে মনে ধনপত ঠিকই করে ফেলেছিল, ধুরুয়া গাঁ থেকে পালিয়ে কোন শহরে যাবে। সেখান থেকে তিন হাজার টাকা কামাই করে এনে প্রথমে চন্দ্রিকা সিংয়ের ঋণ শোধ করবে। তারপর মা-বাপ-ভাইবোনদের সঙ্গে করে আবার শহরে ফিরে যাবে। ধুরুয়া গাঁয়ের শৃঙ্খলিত ভূমিদাসের জীবন থেকে যেভাবেই হোক মুক্তি চাই।

মা-বাপকে এ সব জানাতে তারা শিউরে উঠেছিল। এখান থেকে পালাবার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার ইঙ্গিত দিয়ে বুধিরাম এবং লছিয়া বলেছে, এ রকম মারাত্মক কথা ধনপত যেন ভুলেও আর না ভাবে, বাপ বা নানার মতো যেন একই নিয়মে জীবন কাটিয়ে দেয়। রামজী কিষুণজীর এরকমই ইচ্ছা, এ-ই তাদের অনিবার্য নিয়তি।

কিন্তু বাপ-মা'র কথায় আদৌ সায় ছিল না ধনপতের। মুক্তির চিন্তাটা অদৃশ্য পোকার মতো ধারাল দাঁতে অনবরত তার বুকের শিরা

কেটে গেছে। সে জানিয়েছে, এভাবে চলতে পারে না, পারে না। বড়ে সরকার চন্দ্রিকা সিংরা ভূমিদাসের ওপর যেভাবে জুলুম ওঠাচ্ছে তা বন্ধ হওয়া দরকার। এখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সে মুক্তির দাম কিনে আনবে।

ছেলের জেদ দেখে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছে বুধিরাম এবং লছিয়া। ঠিক হয়েছে, আজ ভোরে কাকপক্ষী চোখ মেলবার আগেই ধনপত ধুরুয়া গাঁ ছেড়ে চলে যাবে।

জামা কাপড় এবং খাবারের পুঁটলিটা বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। সেটা ধনপতের হাতে দিয়ে কাঁপা গলায় লছিয়া বলল, 'দের নায় করনা। এবার বেরিয়ে পড়। লোক জেগে গেলে মুসিবত হয়ে যাবে।'

আর দাঁড়ায় না ধনপত। মা-বাপকে আরেক বার সাহস দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বুধিরাম এবং লছিয়া তার সঙ্গে সঙ্গে সামনের কাচ্চী (কাঁচা রাস্তা) পর্যন্ত এল। তাদের পেছনে ফেলে দূরে পাকা সড়কের দিকে এগিয়ে চলল ধনপত।

খানিকটা যাবার পর একবার পেছন ফিরে তাকাল সে। ঘুমন্ত অচ্ছুৎটুলির একধারে কাঁচা রাস্তার ধারে কুয়াশা এবং অন্ধকারে এখনও দাঁড়িয়ে আছে লছিয়া আর বুধিরাম। দুটো ঝাপসা মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাদের। বিড় বিড় করে আবছা গলায় তারা শুধু বলছে, 'হো রামজী হো কিষুণজী, তেরে কিরপা—'

কিছুক্ষণের মধ্যে ধুরুয়া গাঁ পেছনে ফেলে পাক্কীতে এসে পড়ল ধনপত। দু'ধারে আদিগন্ত ধানের ক্ষেত। ডাইনে এবং বাঁয়ে যেদিকে যতদূর চোখ যায়, সমস্ত জমিই রাজপুত চন্দ্রিকা সিংয়ের।

রাস্তাটা এখনও একেবারে ফাঁকা। কচিৎ কখনো এক-আধটা 'লৌরি' বা সাহারসা-গামী দূর পাল্লার বাস পাশ দিয়ে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে আবছা মতো আলো ফুটল। এখন দু পাশের ধানক্ষেত অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। হাওয়ায় পাকা ধান লক্ষ কোটি

সোনার দানার মতো দুলছে। মাঠ জুড়ে শব্দ হচ্ছে—ঝুন ঝুন ঝুন ঝুন। ধনপত জানে, আর ক'দিনের মধ্যেই চন্দ্রিকা সিংয়ের জমিতে ধান কাটাই শুরু হয়ে যাবে।

এই সাতসকালে আলো চোখে লাগতেই পরদেশি শুগারা (টিয়া) ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। উড়ে উড়ে তারা গিয়ে নামছে ধানক্ষেতে।

ধনপত ভাবছিল, সেই দশ বার বছর বয়স থেকে মা-বাপের সঙ্গে চন্দ্রিকা সিংয়ের ক্ষেতিতে ধান কেটে আসছে সে। এই প্রথম বার সে বেগার খাটবে না।

ভাবনাটা বেশিদূর এগলো না। হঠাৎ পেছন থেকে অস্পষ্ট চিৎকার ভেসে আসে, 'হেই-হেই—' একটা গলা নয়, অনেকে একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে।

চমকে ঘাড় ফেরাতেই ধনপত দেখতে পেল, সাত-আটটা লোক হাঁই হাঁই করতে করতে পাক্কীর ওপর দিয়ে দৌড়ে আসছে। এখনও কুয়াশা পুরোপুরি কাটে নি। তাই লোকগুলোর মুখটুখ পরিষ্কার বোঝা যায় না।

আরেকটু কাছাকাছি আসতেই চেনা গেল। চন্দ্রিকা সিংয়ের পোষা পহেলবান ওরা। সবার হাতেই মোটা মোটা ভারী লাঠি। ধনপতের মনে হয়েছিল, ধুরুয়া গাঁয়ের বিপজ্জনক সীমানা সে পেরিয়ে আসতে পেরেছে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, পহেলবানদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় নি। কিভাবে ওরা টের পেয়ে গেছে, কে জানে।

মুহূর্তের জন্য ভয়ে বুকের ভেতর শ্বাস আটকে গেল ধনপতের। মোষের মতো ঐ পহেলবানগুলোর হাতে পড়লে তার হাল কি দাঁড়াবে, সেটা যেন চোখের সামনে দেখতে পেল সে। সঙ্গে সঙ্গে শিরদাঁড়ার ভেতর দিয়ে বিজরি চমকের মতো কিছু একটা খেলে গেল। পাক্কী থেকে লাফ দিয়ে ধানক্ষেতে নেমে সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল।

'হেই ভুচ্চরকা ছোয়া, রুখ যা, রুখ যা—' চেঁচাতে চেঁচাতে পহেলবানেরাও ক্ষেতিতে নেমে পড়েছে।

আশ্বিন পর্যন্ত ধানক্ষেতে বর্ষার জল জমে ছিল। কার্তিক পড়তে না পড়তেই মাঠ শুকিয়ে একেবারে খটখটে। কখনো শক্ত আলের ওপর

দিয়ে, কখনও ধানগাছের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে উদ্‌ভ্রান্তের ম দৌড়চ্ছে ধনপত।

পহেলবানেরা পিছু ছাড়ে নি। 'রুখ যা, রুখ যা'—করতে করতে তারা সমানে তাড়া করে আসছে।

জামা-কাপড়ের পুঁটলিটার জন্য ভাল করে ছুটতে পারছিল ন ধনপত। মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে পহেলবানেরা ক্রমশ কাছে এসে পড়ছে।

পনের বিশ হাতের ভেতর যখন তারা এসে গেছে সেই সময় ধান ক্ষেতের শেষ মাথায় বরখা নদী চোখে পড়ল ধনপতের।

বরখা বিরাট নদী। কম করে মাইল দেড়েকের মত চওড়া। হিমালয়ের বরফ গলে গলে বরখায় নেমে আসে বলে এই অঘ্রাণ মাসেও তার জলে প্রচণ্ড তোড়। উন্মাদের মতো ছুটতে ছুটতে খাড়া পাড় থেকে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধনপত। যেভাবে পহেলবানেরা তাকে ঘিরে ধরতে শুরু করেছিল তাতে এ ছাড়া বাঁচার কোন রাস্তা নেই।

শিকার হাতছাড়া হয়ে যাবার কারণে পহেলবানদের চোখেমুখে একই সঙ্গে রাগ, আক্রোশ, হতাশা ফুটে বেরোয়। বিশাল লাঠিগুলো মাটিতে ঠুকে দাঁতে দাঁত ঘষে তারা চেঁচায়, 'গিদ্ধড়কা ছৌয়া, ভাগ গিয়া—'

ওদিকে ঠাণ্ডা জোলস্রোত প্রবল টানে ধনপতকে কোণাকুণি ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রথমে কিছুক্ষণ হাত-পা ছুঁড়ে সাঁতরাতে চেষ্টা করে ধনপত কিন্তু জলের শক্তি এমনই বিপুল যে তার বিশেষ কিছুই করার থাকে না। তা ছাড়া মারাত্মক হিমে তার রক্তকণা জমে যেতে থাকে। সে আবছাভাবে টের পায় তার হাত-পা দ্রুত অসাড় হয়ে আসছে। আর বেশিক্ষণ জলের সঙ্গে যুঝতে পারবে না। ক্রমশ বরখা নদী, অঘ্রাণ মাসের সকাল, ধুরুয়া গাঁয়ের সোনালি ধানক্ষেত—সব কিছু তার চোখের সামনে থেকে মুছে যেতে থাকে।



হুঁশ ফেরার পর ধনপত দেখল, বালিতে মুখ গুঁজে সে পড়ে আছে। পাশ দিয়ে বিপুল জলস্রোত ছুটে চলেছে।

এখন দুপুর, সূর্যটা খাড়া মাথার ওপর উঠে এসেছে। অঘ্রাণ মাস বলে রোদে তেমন তেজ বা ধার নেই। তবে কুয়াশা কেটে গেছে।

এখানে কিভাবে এল বা কে তাকে স্তূপাকার বালিতে শুইয়ে দিয়ে গেছে, প্রথমটা বুঝে উঠতে পারে না ধনপত। শরীর বেজায় কমজোরি, মাথাটা টলছে। তবু আস্তে আস্তে হাতের ভর দিয়ে সে উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে নাকমুখ দিয়ে হড় হড় করে জল বেরিয়ে আসতে থাকে।

বমি করার পর খানিকটা আরাম বোধ করে ধনপত। এবার সব কিছু মনে পড়ে যায়। পহেলবানদের তাড়া খেয়ে সে বরখা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্রোতের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে প্রচুর জল তার পেটে ঢুকে যায় এবং ক্রমশ বেহুঁশ হয়ে পড়ে। ধনপত বুঝতে পারছে, বরখা নদীই টানতে টানতে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। এখনও কি করে যে বেঁচে আছে, সেটা ভেবে সে অবাক হয়ে যায়। হো রামজী, হো কিষুণজী, তেরে কিরপা—

কতক্ষণ বালিতে পড়ে ছিল, ধনপত জানে না। তবে রোদে তার গায়ের জামা টামা, এমন কি কম্বল পর্যন্ত শুকিয়ে গেছে। খুব সম্ভব অনেকক্ষণ জলে থাকার জন্য তার হাত-পায়ের আঙুল এবং ঠোঁট এখনও সিঁটিয়ে আছে।

হঠাৎ পুঁটুলিটার কথা মনে পড়ে যায় ধনপতের। ওটার মধ্যেই

রয়েছে তার যাবতীয় পার্থিব সম্পত্তি। চমকে এধারে ওধারে তাকাতেই দেখা যায়, খানিকটা দূরে সেটা পড়ে আছে। তৎক্ষণাৎ তার হাত চলে যায় কোমরের কাছে। ওখানে কয়েকটা টাকা বাঁধা ছিল। সেগুলো সেখানেই আছে। বরখা নদী তার কিছুই ছিনিয়ে নেয় নি।

এবার ভাল করে চারদিকে লক্ষ করে ধনপত। সে আন্দাজ করে নেয়, স্রোতের টানে ওপার থেকে কোণাকুণি সে এপারে ভেসে এসেছে। এখান থেকে চন্দ্রিকা সিংয়ের আদিগন্ত জমিগুলির একটা ধানের শিষও চোখে পড়ে না। ওপারে সোজাসুজি যেটুকু দেখা যায় তা ধু-ধু, ঝাপসা। সামনে বরফ-গলা জল একটানা গম গম শব্দ করে দুর্জয় বেগে ছুটে যাচ্ছে। এছাড়া আর কোথাও কোন আওয়াজ নেই। ধনপতের দু ধারে মাইলের পর মাইল বাদামী বালির পাড় অঘ্রাণের রোদে ঝিকমিক করছে। মাথার ওপর দিয়ে পরদেশি শুগার ঝাঁক উড়ে উড়ে নদী পেরিয়ে চলে যাচ্ছে।

জায়গাটা খুবই নির্জন। কোথাও মানুষজন চোখে পডছে না।

ধনপত আর বসে থাকল না, পুঁটুলিটা তুলে নিয়ে বালির পাড় ধরে হাঁটতে লাগল। তাকে শহরে যেতে হবে।

শরীর এখনও বেশ দুর্বল, আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগল সে।

কিন্তু খানিকটা যেতে না যেতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হল ধনপতকে। একটু দূরে জলের ধার ঘেঁষে উপুড় হয়ে বালিতে ধাড় গুঁজে কে যেন পড়ে আছে। মুখটা দেখা যাচ্ছে না। তবে পরনের আলুথালু শাড়ি আর মাথার পর্যাপ্ত চুল দেখে বোঝা যায় সে মেয়েমানুষ।

আওরতটা এই নির্জন নদীর পাড়ে এল কোত্থেকে? তার মতই কি বরখার প্রবল তোড়ে ভাসতে ভাসতে এখানে এসে ঠেকেছে? কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে ধনপত। তারপর আস্তে আস্তে ডাকে, 'তুম কৌন হো—'

সাড়া পাওয়া গেল না। নড়াচড়ারও কোন লক্ষণ নেই। হঠাৎ রক্তের ভেতর চমক খেলে যায় ধনপতের। আওরতটা বেঁচে আছে তো? পরক্ষণেই সে ভাবে, বেঁচে থাক বা মরে যাক, তাতে তার কিছুই

যায় আসে না। ধনপতের সহজাত বুদ্ধি এবং অভিজ্ঞতা তাকে অস্পষ্ট-ভাবে জানিয়ে দেয়, যে মেয়েমানুষ এভাবে নির্জন নদীর পাড়ে পড়ে থাকে তার পেছনে নিশ্চয়ই কোন মারাত্মক ধরনের ঝঞ্ঝাট রয়েছে। এক মুহূর্তও তার এখানে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক নয়। ভাবে বটে, কিন্তু চলে যেতে পারে না। অদৃশ্য অলৌকিক কিছু একটা তাকে যেন ধাক্কা মারতে মারতে জলের কিনারে মেয়েমানুষটার কাছে ঠেলে নিয়ে যায়।

দূর থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নি। কাছে এসে শিউরে ওঠে ধনপত। আওরতটার শাড়ির অনেক জায়গা ফালা ফালা। তাতে রক্তের অজস্র ছোপ। তবে টাটকা রক্ত নয়। মনে হয়, কেউ তাকে খুন বা জখম করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। বহুক্ষণ জলে ভেজার পর যেমন হয়, কাপড়চোপড়ে তেমনই ফিকে রক্তের দাগ।

রুদ্ধশ্বাসে ধনপত ডাকে, 'এ আওরত—'

এবারও উত্তর মেলে না।

কিছুক্ষণ বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে থাকে ধনপত। তারপর পুঁটুলিটা একধারে রেখে হাঁটু গেঁড়ে মেয়েমানুষটার পাশে বসে পড়ে। তার কাঁধ ধরে আস্তে আস্তে চিত করে শুইয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আরেক বার তাকে শিউরে উঠতে হয়।

আওরতটার বয়স বেশি নয়, বড় জোর বিশ বাইশ। তার আধ-বোজা চোখের দৃষ্টি স্থির। গাল এবং গলার মাংস খোবলানো, কপালের চামড়া অনেকটা ছিঁড়ে গেছে। কণ্ঠার হাড় আর দু হাতের আঙুল থ্যাতলানো। গায়ে জামা নেই। সেটা যে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে তা টের পাওয়া যায়। একটা হাতা শুধু ডান হাতে আটকে আছে। আঘাতের জায়গাগুলো টকটকে লাল। সেখানে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। মনে হয়, কোন হিংস্র জানবর আঁচড়ে কামড়ে দুমড়ে মুচড়ে মেয়েটাকে শেষ করে দিয়েছে।

কি ভেবে দ্রুত তার নাকের নিচে হাত রাখল ধনপত। সঙ্গে সঙ্গে তার বুকের ভেতর তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। খুব আস্তে তির তির

করে নিঃশ্বাস পড়ছে মেয়েটার। এবার আলগোছে তার কপালে হাত দিল ধনপত। শরীরে এখনও তাপ আছে। অর্থাৎ মেয়েটা মরে যায় নি। চেষ্টা করলে তাকে বাঁচানো যায়।

মেয়েটার শরীরটা পুরোপুরি বালির ডাঙায় নেই, হাঁটু পর্যন্ত দুটো পা জলের ভেতর ডুবে আছে।

দুই হাতে মেয়েটার শরীর তুলে নিয়ে খানিকটা দূরে বালির ওপর টান টান করে শুইয়ে দিল ধনপত। নিজের পুঁটুলিটা তার মাথার নিচে বালিশের মতো করে রাখল।

মেয়েটার চুল, হাত-পা—সবই ভেজা। প্রথমে খুব যত্ন করে সে সব মুছিয়ে দিল ধনপত। একটু গরম জল পাওয়া গেলে খুব ভাল হত। মেয়েটাকে বাঁচাতে হলে যা দরকার তা হল উত্তাপ। ধনপত তার দুই হাত এবং পায়ের তালু অনবরত ঘষে ঘষে তার শরীরে জরুরি উষ্ণতাটুকু ফিরিয়ে আনতে লাগল। অনেকক্ষণ পর চোখের পাতা নড়ে ওঠে মেয়েটার। আগের চেয়ে জোরে শ্বাস পড়তে থাকে। বোঝা যায়, মৃত্যুর শেষ সীমারেখা থেকে সে ফিরে আসছে।

আরো কিছুক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে চোখ মেলে মেয়েটা। তার চাউনি ঘোলাটে, আচ্ছন্ন। কিছুই সে যেন চিনতে পারছে না।

একসময় ঘোলাটে ভাবটা কেটে যায়। মুখের ওপর একটা অপরিচিত জোয়ান ছোকরাকে ঝুঁকে থাকতে দেখে একটু অবাকই হয় মেয়েটা, ঝাপসা দুর্বল গলায় শুধোয়, 'হামনি কঁহা হ্যায়?'

ধনপত জানায়, সে বরখা নদীর পাড়ে শুয়ে আছে।

কী বলতে গিয়ে পরক্ষণে মেয়েটার নজর এসে পড়ে নিজের ওপর। তক্ষুণি শিউরে ওঠে সে, রক্তমাখা ফালা ফালা শাড়িটা টেনে সারা গা ঢাকতে ঢাকতে দু হাতে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ে গেছে তার।

মেয়েটার জন্য এক ধরনের মমতা বোধ করে ধনপত। নরম গলায় বলে, 'রো মাত্, রো মাত্। দুব্লা শরীরে কাঁদলে শরীর আরো কমজোরি হয়ে যাবে।'

মেয়েটা ধনপতের কথা খুব সম্ভব শুনতে পায় না, একটানা কেঁদেই চলে।

বেশ কিছুক্ষণ পর কান্না থামে। কিন্তু মুখ থেকে হাত সরায় না মেয়েটা। ধনপত জিজ্ঞেস করে, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

ভাঙা উদাস গলায় মেয়েটা বলে, 'চৌবেজি আর তার লোকেরা কাল রাত্তিরে আমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। মনে হয়, ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছি।' একটু চুপ করে থেকে ফের বলে, 'আমি তো মরেই যেতাম। জরুর তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ।'

ধনপত থতমত খায়। বলে, 'হাঁ—মতলব—'

'কেন আমাকে বাঁচালে? মরলেই ভাল হত।'

এ কথার জবাব হয় না, ধনপত চুপ করে থাকে।

মেয়েটা এবার শুধোয়, 'তুমি এখানে এলে কী করে?'

ধনপত বলে, 'আমরা কথা পরে শুনো। তোমার কথা বল। চৌবেজি কৌন?'

'আমার গাঁওকা আদমী। বহোত জমিনকা মালিক। বরাম্ভন।'

'সে-ই তোমার এমন বুরা হাল করে নদীতে ফেলে দিয়েছে?'

উত্তর দেয় না মেয়েটা, আস্তে মাথা নেড়ে চুপ করে থাকে।

চৌবেজির মতো বড় জমি-মালিক কেন মেয়েটাকে এভাবে জখম করে রক্তাক্ত অবস্থায় নদীতে ফেলে দিয়েছে, ভেবে পায় না ধনপত। জিজ্ঞেস করতে গিয়ে তার মনে হয়, এ সব জেনে কী লাভ! তাকে অনেক দূরের শহরে যেতে হবে। বরখা নদীর পাড়ে বসে কারো দুঃখের কথা শুনবার মতো অঢেল সময় হাতে নেই। কিন্তু মেয়েটার শরীরের যা হাল, তাতে তাকে ফেলে যাওয়াও যায় না। মেয়েটা সম্পর্কে কেমন একটা দায়িত্ব যেন এসে গেছে ধনপতের। একটা কিছু ব্যবস্থা না করে গেলে যেখানেই যাক, মনটা খচখচ করতে থাকবে।

ধনপত ডাকল, 'এ আওরত—'

আধফোটা গলায় সাড়া দিল মেয়েটা. 'হাঁ—'

'তোমাদের ঘর কোথায়?'

'দখিপুরা গাঁওয়ে—নদীর ওপারে।' মেয়েটা বলে যায়, 'আমাদের গাঁও দিয়ে কী হবে ?'

দখিপুরার নাম শুনেছে ধনপত। সেখানে না গেলেও গাঁ-টা কোথায়, সে সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা আছে। সে বলে, 'চল, তোমাকে সেখানে পৌঁছে দিয়ে যাই।'

মেয়েটা প্রায় শিউরে ওঠে, 'নহী, নহী, নহী।'

'কী হল ?' ধনপত অবাক হয়ে যায়।

'হামনি গাঁওমে নহী লোটেগি (আমি গায়ে ফিরব না)। কভি নহী।'

'কায় ?'

'আমাকে দেখলে চৌবেজি জরুর খুন করে ফেলবে।'

কিছুক্ষণ চিন্তা করে ধনপত বলে, 'তাহলে কোথায় যাবে বল। তোমাকে সেখানে রেখে যাই।'

মেয়েটা জানায়, এই পৃথিবীতে তাকে আশ্রয় দেবার মতো কোথাও কেউ নেই।

এবার বিরাট সমস্যায় পড়ে যায় ধনপত। শুশ্রূষা করে মেয়েটার জ্ঞান ফেরাবার আগে কে ভাবতে পেরেছিল, তাকে নিয়ে এরকম ঝঞ্ঝাট হবে। সে খুবই বিপন্ন বোধ করতে থাকে।

মেয়েটা খুব সম্ভব ধনপতের মনোভাব বুঝতে পারে। বলে, 'আমার জন্যে তুমি অনেক করেছ। আরেকটু কষ্ট করে আমাকে ঢুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় যদি দিয়ে যাও—'

ঢুধলিগঞ্জের হাটিয়া বা হাটের কথা ধনপতের অজানা নয়। বিশ পঁচিশ মাইলের ভেতর এত বড় হাট এ অঞ্চলে আর নেই। তবে কখনও সেখানে তার যাওয়া হয় নি।

'ঢুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় যেতে চাইছ কেন ?' ধনপতের চোখে মুখে এবং গলার স্বরে রীতিমত বিস্ময়ই ফোটে।

মেয়েটা এবার যা বলে তা এইরকম। এই অঘ্রাণ মাসে ধান কাটার মরসুম শুরু হয়ে যাবে। এ দিকের তাবত ভূমিহীন ক্ষেতমজুর এসময়

দুধলিগঞ্জের হাটের এক ধারে গিয়ে সারাদিন বসে থাকে।

জমি-মালিকরা তাদের ভেতর থেকে শক্তসমর্থ চেহারার কিষাণ বেছে নিয়ে যায়। তাতে ভাল মজুরি আর খোরাকি বাবদ গেঁহু বা বাজরার আটা আলু তেল লবণ মরিচ ইত্যাদি মেলে। ধানকাটা হয়ে গেলে মালিক কাজ থেকে অবশ্য ছাড়িয়ে দেয়। মেয়েটার ইচ্ছা, আপাতত ওখানে গিয়ে একটা কাজ জুটিয়ে নেবে।

শুনতে শুনতে ধনপতের ভাবনার মধ্যে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। নেহাৎ ঝোঁক এবং জেদের বশে বেগারি প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই সে ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়েছে। তার মাথায় ভাসা ভাসা একটা ধারণা আছে, শহরে গেলে পয়সা কামাইয়ের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কিন্তু সে শহর কোথায়, কত দূরে, কী ধরনের কাজ সেখানে পাওয়া যাবে—এ সব সম্বন্ধে পরিষ্কার করে ধনপত কিছু জানে না। জনমদাসের আবদ্ধ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য সে ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অদম্য মনের জোর তার। ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরুবার আগে সে ঠিকই করে রেখেছিল, একটা শহর খুঁজে বার করবেই। পাটনা রাঁচী ধানবাদ বা ঝরিয়া—এই সব 'ভারী ভারী টৌনে'র নাম সে জানে। লোকের কাছে হদিশ জেনে এই সব শহরের কোন একটাতে সে কি আর পৌঁছতে পারবে না? নিশ্চয়ই পারবে।

অজানা শহর খোঁজার ব্যাপারটা তো আছেই। তার আগে মেয়েটার কাছে দুধলিগঞ্জের যে খবর পাওয়া গেছে সেটা কাজে লাগানো যেতে পারে। কাজ জুটলে খোরাকি যা মিলবে তাতে পেটটা চলে যাবে, মজুরিটা পুরোপুরিই বাঁচবে। কিছু পয়সা জমিয়ে নতুন উৎসাহে সে অজানা শহর খুঁজতে বেরুবে। পয়সা হাতে থাকলে মনের জোর বেড়ে যায়।

ধনপত শুধোয়, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়া তুমি চেনো?'.

মেয়েটা ঘাড় হেলিয়ে জানায়—চেনে।

'কতদূর এখান থেকে?'

'লগভগ দো মিল। নদীর কিনার দিয়ে দিয়ে চলে যাওয়া যাবে।'

এদিকে বেলা বেশ বেড়ে গেছে। পুবদিকে আকাশ যেখানে পিঠ বাঁকিয়ে দিগন্তের নিচে নেমেছে ঠিক সেইখান থেকে লাফ দিয়ে সূর্যটা অনেকখানি ওপরে উঠে এসেছে। ছিটেফোঁটা কুয়াশার চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। চারদিক ঝকঝকে পরিষ্কার। ভোরের দিকে দু-চারটে পরদেশি শুগা দেখা যাচ্ছিল আকাশে। এখন তারা ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়েছে। বেলা চড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোদের তাপও কিছু বেড়েছে। বাতাসে হিমের ভাব ততটা আব নেই।

ধনপত জিজ্ঞেস করল, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়া কখন বসে?'

'সুবেসে—' মেয়েটা বলে।

'কতক্ষণ চলে?'

'সন্ধে পর্যন্ত।'

'চল, এবার যাই। দো মিল বাস্তা যেতেও তো সময় কম লাগবে না।'

বলামাত্রই কিন্তু ওঠে না মেয়েটা, বালির ওপর যেমন পড়ে ছিল তেমনই পড়ে থাকে।

ধনপত তাড়া লাগায়, 'কা হুয়া, উঠে পড়। সুরয চড়ে যাচ্ছে।'

এবারও নড়াচড়ার লক্ষণ নেই মেয়েটার। সে শুধু অস্পষ্ট কাঁপা গলায় বলে, 'ক্যায়সে যাওগী?'

এতক্ষণে হুঁশ হয় ধনপতের। যে রক্তাক্ত ছেঁড়াফাঁড়া কাপড়টা গায়ে কোনরকমে জড়িয়ে জড়সড় হয়ে মেয়েটা পড়ে আছে, সেটা পরে দুধলিগঞ্জের হাটিয়া পর্যন্ত যাওয়া অসম্ভব। হঠাৎ নিজের পুঁটুলিটার কথা মনে পড়ে যায় তার। ওটাতে ঠেটি 'ফুর'প্যান্ট পাজামা এবং একটা ধুতি রয়েছে।

দ্রুত পুঁটুলি থেকে ধুতিটা বার করে মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দেয় ধনপত। বলে, 'এটা তুরন্ত পরে নাও।' বলেই বড় বড় পা ফেলে খানিকটা দূরে গিয়ে পেছন ফিরে দাঁড়ায়।

কিছুক্ষণ পর আবছা গলা ভেসে আসে, 'আমার হয়ে গেছে।'

ঘাড় ফেরাতেই ধনপত দেখতে পায়, মেয়েটা ধুতি পরে দাঁড়িয়ে

আছে। হাতে তার সেই রক্তের দাগ-ধরা ছেঁড়া শাড়িটা। আস্তে আস্তে ধনপত তার কাছে ফিরে আসে। শাড়িটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলে, 'ওটা দিয়ে আর কী হবে ? ফেলে দাও—'

'লেকেন—'

'কা ?'

'তোমার কাপড়া তো ফেরত দিতে হবে। তখন পরব কী ?'

এ দিকটা ভেবে দেখে নি ধনপত। একটু চিন্তা করে সে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই মেয়েটা আবার শুরু করে, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় গিয়ে সুই-সুতো যোগাড় করে দিও। আমার শাড়িটা শেলাই করে তোমার কাপড়া ফেরত দেব।'

ধনপত জানায়, শাড়িটার যা হাল হয়েছে, হাজার মেরামত করলেও আর পরা চলবে না। ব্যবহারের অযোগ্য এই বস্তুটা অকারণে বয়ে নিয়ে যাবার অর্থ নেই। শাড়িটা ফেরত দিতে হবে না। ওটা যখন মেয়েটা পরেই ফেলেছে তখন গা থেকে খুলে নেবে—এমন চামার ধনপত নয়।

মেয়েটার সঙ্কোচ যেন হাজার গুণ বেড়ে গেল। একে তো এই অচেনা জোয়ান ছেলেটা তার প্রাণ বাঁচিয়েছে, তার ওপর একটা আস্ত ভাল ধুতি একেবারেই দিয়ে দিতে চাইছে। কুণ্ঠিত মুখে সে বলে, 'লেকিন—'

'লেকেন উকেন কুছ নহী—' প্রবলভাবে হাত এবং মাথা নেড়ে মেয়েটার সব কুণ্ঠা ঝেড়ে ফেলে ধনপত। তারপর নিজের পুঁটুলিটার দিকে এগিয়ে যায়। সেটা বালির ওপর খোলা পড়ে আছে।

পুঁটুলিটা ফের বাঁধতে গিয়ে ধনপতের চোখে পড়ে, 'ফুর' প্যান্ট, পাজামা ইত্যাদির ভাঁজে ভাঁজে চাপাটি, লিট্টি, ঘাটো এবং সেদ্ধ রাঙা আলু রয়েছে। রাস্তায় খাবার জন্য মা এগুলো গুছিয়ে দিয়েছিল।

জলে ভিজে চাপাটি আর লিট্টি একেবারে কাদার তাল হয়ে গেছে। ওগুলো আর খাওয়া চলে না। তবে ঘাটো এবং সেদ্ধ রাঙা আলু এখনও ভালই আছে। সেগুলো দেখতে দেখতে পেটের ভেতর খিদেটা

চনচনিয়ে ওঠে ধনপতের। কাল ভোরে ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরুবার পর যে সব ভয়াবহ এবং উত্তেজক ঘটনা ঘটেছে তাতে খাওয়ার কথা মনেই ছিল না তার।

গলে যাওয়া রুটি আর লিট্টিগুলো ফেলে রাঙা আলু সেদ্ধ এবং ঘাটো বার করতে গিয়ে মেয়েটার কথা খেয়াল হয় ধনপতের। ঘাড় ফিরিয়ে হাত নেড়ে তাকে কাছে ডাকে সে। বলে, 'জরুর তোমার ভুখ লেগেছে?'

খিদে নিশ্চয়ই পেয়েছে। কিন্তু এই অপরিচিত জোয়ান ছেলেটা অযাচিতভাবে তাকে অনেক কিছু দিয়েছে। এর পরও তার খাবারে ভাগ বসাবার কথায় একেবারে কুঁকড়ে যায় মেয়েটা। মুখ নামিয়ে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে। বিব্রত ভাবে বলে, 'নহী, নহী, নহী—'

স্থির চোখে মেয়েটার দিকে তাকায় ধনপত। জিজ্ঞেস করে, 'কাল শেষ কখন খেয়েছ?'

'সামকো (সন্ধ্যায়)।'

'তারপর পুরা রাত কেটেছে। এখন চড়তি সূরয মাথার ওপর উঠে আসছে। আর বলছ ভুখ লাগে নি?'

মা-বাপ ছাড়া এমন সহানুভূতি বা মমতার সুরে আর কেউ তার সঙ্গে কথা বলে নি। মেয়েটার চোখে প্রায় জল এসে যায়। সে চুপ করে থাকে।

ধনপত ঘাটো আর আলুসেদ্ধ সমান দু ভাগ করে একটা অংশ মেয়েটাকে দেয়। তারপর নিজের ভাগ থেকে গোগ্রাসে খেতে থাকে।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে, পুঁটলিটা কাঁধে ফেলে নরম সোনালী বালির ওপর পা ফেলে ফেলে খাড়া দক্ষিণে হাঁটতে থাকে ধনপত। তার পাশাপাশি মেয়েটাও চলেছে।



একপাশে বরখা নদী প্রবল তোড়ে ছুটে যাচ্ছে। আরেক পাশে, বালির পাড়ের ওপর থেকে ঝোপঝাড় আগাছার জঙ্গল। ফাঁকে ফাঁকে পরাস সিমার এবং পিপর গাছগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে আছে। তবে সব চাইতে বেশি করে যা চোখে পড়ে তা হ'ল ট্যারাবাঁকা চেহারার অজস্র সীসম গাছ। মাঝে মাঝেই ঝোপঝাড় থেকে সর্বন পাতার খুশবু ভেসে আসছে।

এই নির্জন চরাচরে পরদেশী শুগার ঝাঁক ছাড়া প্রচুর মাণিক পাখি এবং সিল্লি দেখা যাচ্ছে। শীতের সময় কোন সুদূর অজানা দেশ থেকে তারা এখানে চলে আসে কে জানে।

নদী আকাশ পাখি গাছপালা বা অঘ্রাণ মাসের ঘন সোনালী রোদ—কোনদিকেই লক্ষ নেই ধনপতের। পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে তার চোখ বার বার সঙ্গিনীর দিকে চলে যাচ্ছিল।

এই মেয়েটা সম্পর্কে যেটুকু ধনপত জেনেছে তা খুবই সামান্য। ক্রমশ সঙ্গিনীর ব্যাপারে তার কৌতূহল বাড়তে থাকে। একসময় সে বলে, 'তখন বলেছিলে তোমাদের গাঁওয়ের নাম তুবিপুরা, তাই না?' কথাটা শেষ না করেই থেমে যায় ধনপত। মেয়েটা বলে, 'হাঁ।'

'সেখানে আর কে কে আছে?'

'বাপ-মা-ভাই-বহীন।'

'সাদী উদি হুয়া?

'নহী।'

একটু ভেবে ধনপত এবার শুধোয়, 'মা-বাপ থাকতে তাদের কাছে না গিয়ে দুধলিগঞ্জের-হাটিয়ায় কাজে খোঁজের যাচ্ছ যে?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে মেয়েটা। তারপর বিষণ্ণ মুখে বলে, 'তোমাকে তো আগেই বলেছি, দধিপুরায় ফিরে গেলে চৌবেজি আমাকে খুন করে ফেলবে।' একটু থেমে জানায়, মা-বাপ তাকে চৌবেজির হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। তা ছাড়া তার কারণে তারাও বিপন্ন হয়ে পড়বে। ভয়ানক খতরনাক আদমী চৌবেজি।

ধনপত জিজ্ঞেস করে, 'তোমাকে খুন করবে কেন চৌবেজি?'

এরপর এলোমেলোভাবে নিজের জীবনের যাবতীয় কথা বলে যায় মেয়েটা। সে সব সাজিয়ে নিলে মোটামুটি যা দাঁড়ায় তা এইরকম।

মেয়েটার নাম চাঁদিয়া। জাতে তারা কোয়েরি অর্থাৎ জল-অচল অচ্ছুৎ। ধনপতদের মতো চাঁদিয়ারা ঠিক বেগার খাটা জনমদাস নয়, তার থেকে সামান্য ওপরের স্তরের মানুষ।

চাঁদিয়ার বাপ দুধনাথের সাত বিঘে এগার ধুর চাষের জাম আছে। মোট ছ'জনের সংসার তার। দুধনাথ, তার ঘরবালী কবুতরী এবং চার ছেলেমেয়ে। ভাইবোনদের ভেতর সাবর বড় চাঁদিয়া।

সাত বিঘে এগার ধুর এক-ফসলী জমিতে যেটুকু ধান টান ফলে তাতে ছ'টা মানুষের পেট চলে না। তাই দধিপুরা গাঁয়ের সব চাইতে বড় জমিমালিক চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ অধিকলাল চৌবের জমিতে বা খামারে সপরিবারে চাষের সময় এবং ফসল কাটাইয়ের মরসুমে খাটতে হয় দুধনাথকে। এই রকম আরো কিছু কিছু উঞ্ছবৃত্তি করে সংসার চালাতে হয় তাকে।

মোটামুটি দিন কেটে যাচ্ছিল। কিন্তু বিপদ বাধাল চাঁদিয়ার যৌবন।

চৌবেজি এমনিতে ভয়ানক শুদ্ধাচার মেনে চলে। সকালে স্নান টান সেরে বিষ্ণুজীর মন্দিরে পূজা না চড়িয়ে জল পর্যন্ত খায় না। জাতপাতের বিচারও তার মারাত্মক। অচ্ছুৎদের ছায়া পর্যন্ত মাড়ায় না। কোন কারণে দোসাদ-ধাঙড়-তাতমা বা কোয়েরিদের ছোঁয়া লেগে গেলে

বার নাহানা সেরে নিজের দেহকে শুধ্‌ বা শুদ্ধ করে নেয় সে।

অচ্ছুৎদের সম্বন্ধে চৌবেজির মনোভাব যেমনই হোক, তাদের ঘরের রী যুবতী মেয়েদের ব্যাপারে জাতওয়ারি সওয়ালটা সে বেমালুম ভুলে । অচ্ছুৎদের যুবতী মেয়েরা তার কাছে একেবারেই অস্পৃশ্য নয়, খুবই কাম্য বস্তু। এ ব্যাপারে তার ডাবল স্ট্যাণ্ডার্ড। দখিপুরা : তার চারপাশের গ্রামগুলোতে কোয়েরি দোসাদদের ঘরের মেয়েরা হয়ে উঠলে রেহাই নেই। দুধনাথ পহেলবান পাঠিয়ে তাকে টেনে য় যাবেই। আবহমান কাল ধরে এটা একটা অনিবার্য প্রথায় ড়িয়ে গেছে যেন।

অবধারিত নিয়মেই চৌবেজির নজর এসে পড়েছিল চাঁদিয়ার ওপর। াম প্রথম গোপনে চর পাঠিয়ে তাকে লোভ দেখাতে চেয়েছে বেজি। দামী জগমগ শাড়ি, গোছা গোছা রঙিন বেলোয়াড়ি চুড়ি, ারনার (সাজগোজের) জিনিস, কজরৌটি, চাঁদির গয়না থেকে শুরু ়র টাকা পয়সা পর্যন্ত দিতে চেয়েছে।

কিন্তু অচ্ছুৎটুলির অন্য মেয়েদের থেকে চাঁদিয়া একেবারেই আলাদা। র শিরদাঁড়া বেশ শক্ত। চৌবেজির চরদের মুখে তিন বার 'থুক' ়য়ে সে ভাগিয়ে দিয়েছে। আওরতের জীবনের সব চেয়ে যা সেরা বস্তু র্থাৎ শুধ্‌ দেহ—সেটা সে কোনমতেই খোয়াতে রাজী না। এতে তার হবার হবে।

অধিকলাল চৌবে খুবই নাছোড়বান্দা খতরনাক জানবর। একবার খন চাঁদিয়া তার নজরে পড়েছে, তার মাংস না চিবিয়ে সে ছাড়বে না। লাভ দেখিয়ে যখন কাজ হল না তখন 'টেড়া' রাস্তা ধরল। লোক দিয়ে াসাতে লাগল। কিন্তু তাতেও চাঁদিয়াকে কব্জা করা সম্ভব হ'ল না। ব সময় সে একটা ধারালো দা কোমরে গুঁজে ঘুরত। চৌবের লোকেরা াছাকাছি এলেই অস্ত্রটা বার করে দেখাত।

অধিকলালের পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে এমন ব্যাপার আর কখনও াটে নি। সে হাত বাড়িয়েছে, অথচ কোন যুবতী তার কাছে ধরা দেয় া—এ প্রায় অবিশ্বাস্য। কাজেই কোয়েরিদের এক যুবতী মেয়ের তেজী

শিরদাঁড়া 'চূরণ' (চূর্ণ) করার জন্য চৌবেজির রোখ চেপে গিয়েছিল।

দধিপুরার অচ্ছুৎটুলিতে চাঁদিয়াদের পাশাপাশি দু'খানা টুটাফুট টিনের চালের ঘর। এক ঘরে সে আর তার ছোট ভাইবোনেরা শো অন্য ঘরটা দুধনাথ এবং কবুতরীর। কাল রাতে অঘ্রাণ মাসের মারাত্ম হিমে গোটা দধিপুরা গাঁ যখন কাঁথা এবং কম্বলের তলায় আড়ষ্ট হ পড়ে আছে সেই সময় টিনের চাল কেটে চাঁদিয়ার ঘরে ঢুকেছি চৌবেজির পোষা পহেলবানেরা। চাঁদিয়া কিছু বুঝবার বা চেঁচি উঠবার আগেই মুখে কাপড় গুঁজে দরজা খুলে তাকে তুলে নিয়ে সো চলে গিয়েছিল চৌবেজির খামার বাড়িতে। সেখানে চতুর্বেদী শু বরাম্ভন প্রথমে তার চরম ক্ষতিটি করে। পরে চৌবের উচ্ছিষ্ট নি তার পহেলবানেরা কামড়াকামড়ি শুরু করে দেয়। অবশেষে বেহুঁ রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত চাঁদিয়াকে ওরা বরখা নদীতে ফেলে দিয়েছিল।

চৌবেজিদের ধারণা সে আর বেঁচে নেই। তার মৃত্যুই ওদের কা একান্ত কাম্য। চাঁদিয়া যদি এখন গাঁয়ে ফিরে যায়, চৌবেজির কুকর্মে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে, সেটা কোন ভাবেই তার কাছে বাঞ্ছনী নয়।

অবশ্য এর আগে কি অচ্ছুৎদের ঘরের যুবতী মেয়ের সর্বনা করে নি চৌবেজি? নিশ্চয়ই করেছে। কিন্তু সে সব লুকিয়ে ছাপিয়ে অচ্ছুৎরা এ নিয়ে বিশেষ গোলমাল করে নি, চিরাচরিত প্রথা বা নিয় হিসেবেই মেনে নিয়েছে। কিন্তু প্রথম থেকেই চাঁদিয়া ঘাড় বাঁকি রয়েছে। অনেক করেও যখন তাকে বাগে আনা যায় নি তখন বাঁব পথ ধরেছে চৌবেজি। যেভাবে সে চাঁদিয়াকে তুলে নিয়ে গেছে জানতে পারলে দধিপুরা গাঁয়ের লোকেরা ভয়ে হয়ত মুখ খুলবে না, তা মনে মনে তিনবার তাকে থুক দেবে। তা ছাড়া মেয়েটা যেরকম তে তাতে বেঁচে থাকলে একটা তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়ে ছাড়বে। পাছে সাক্ষী রাখবে না বলেই শীতের বরফ গলা জলে চাঁদিয়াকে ছুঁড়ে দেও হয়েছিল। হঠাৎ এখন যদি সে ফিরেও যায় চৌবেজি তাকে কিছুতে বেঁচে থাকতে দেবে না।

আত্মহত্যা তো করা যায় না। তাই চাঁদিয়া ঠিক করেছে দুধলিগঞ্জের টিয়ায় গিয়ে একটা কাজ টাজ জুটিয়ে নেবে। নিজের পেটের জন্য ছু কামাই করা দরকার।

ধর্ষিতা মেয়েটার কথা শুনতে শুনতে গভীর সহানুভূতিতে মন ভরে য় ধনপতের।

ধনপত সম্পর্কেও চাঁদিয়ার কৌতূহল কম নয়। নিজের কথা শেষ ার পর সে বলে, 'এখানে তুমি কী করে এলে? তোমাদের গাঁও াথায়?'

ধনপত নিজের কথা বলে যায়। জীবনের কোন ঘটনাই প্রায বাদ য না।

সব শুনে গভীর দুঃখের গলায় চাঁদিয়া বলে, 'তোমার আর আমার ল একই রকম। বাপ-মা-ভাইবোনের কাছে ফেরার রাস্তা দু'জনেরই ।'

'হাঁ।' ধনপতকে বিমর্ষ দেখায়।

'জীওনে আর হয়ত কেউ গাঁওয়ে ফিরতে পারব না।' চাঁদিয়াব গলাব ৷ গাঢ় বিষাদে বুজে আসে।

ধনপত খানিকটা জোর দিয়ে বলে, চাঁদিয়ার কথা সে জানে না। ব সে নিজে তাদের ধুরুয়া গাঁয়ে ফিরবেই। টাকাপয়সা কামাই করে মদাসের ঘৃণ্য জীবন থেকে মা-বাপ-ভাইবোনদের মুক্ত করে আনবেই।

চাঁদিয়া বলে, 'তুমি তো টৌনে যাবে?'

'হাঁ।'

'কোন টৌনে?'

ধনপত জানায়, কোন্ টৌন সে জানে না। আপাতত সে স্থির করেছে দিয়ার সঙ্গে দুধলিগঞ্জের হাটিয়াতেই যাবে। কোন জমিমালিক যদি কে পছন্দ করে, তার কাছেই কাজ নেবে।

চাঁদিয়ায় চোখমুখ উজ্জ্বল দেখায়। সে বলে, 'ভালই হ'ল, দেখি যদি জগহতেই (জায়গাতেই) দু'জনের কাজ জুটে যায়।'

ধনপত উত্তর দেয় না।

চাঁদিয়া একটু পর বলে, 'ভগোয়ান রামজিকা কিরপা, তাই বর
নদীতে ভাসতে ভাসতে এখানে চলে এসেছিলে। না হলে—'

ধনপত শুধোয়, 'না হলে কী?'

'আমি বাঁচতাম না। নদার কিনারে মরে পড়ে থাকতাম। গিধের
আমাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত।

ধনপত কিছু বলে না, মুখ ফিরিয়ে সঙ্গিনীকে একবার দেখে মাত্র
তার দু চোখে অপার মমতা।

রশিভর হাঁটার পর হঠাৎ ধনপতের নজরে পড়ে, স্বাভাবিকভাবে প
ফেলতে পারছে না চাঁদিয়া। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছে
মুখ চোখ দেখে বোঝা যায়, ভীষণ কষ্ট হচ্ছে তার।

ক্ষতবিক্ষত জখমী শরীরে এই যে চাঁদিয়া হাঁটছে, সে শুধু অদম
মনের জোরে।

ধনপত বলে, 'কা, পাও তুখাতা হ্যায় (পায়ে যন্ত্রণা হচ্ছে)?'

শারীরিক কষ্টটা অগ্রাহ্য করবার জন্যই বোধ হয় শরীরটা টান টা
করে দাঁতে দাঁত চেপে হাঁটতে চেষ্টা করে চাঁদিয়া। বলে, 'নহী, নহী—
প্রথম প্রথম ধনপতের কাছে তার যেটুকু সঙ্কোচ বা লজ্জা ছিল, ক্রমশ
কেটে যাচ্ছে। এই জোয়ান ছেলেটার মমতা যত্ন এবং সহানুভূতিতে
অভিভূত। যদিও তার খোয়াবার মতো আর কিছুই নেই তবু যুব
মেয়ের পক্ষে একা একা চলা খুবই বিপজ্জনক। পাছে ধনপত তা
ফেলে চলে যায়, সেই কারণে দৈহিক যন্ত্রণাকে সে অস্বীকার করেছে।

কিন্তু বালির ওপর দিয়ে কয়েক পা যেতে না যেতেই আব
খোঁড়াতে থাকে চাঁদিয়া।

কোমল গলায় ধনপত বলে, 'একটু জিরিয়ে নাও।' সে আরো ব
জখমী দুব্‌লা শরীরে একটানা 'দো মিল' হেঁটে দুধলিগঞ্জে যাওয়া ঠি
হবে না।

যন্ত্রণাটা এবার বোধহয় বেশিই হচ্ছিল। আর কিছু না বলে বালি
ওপর বসে পড়ে চাঁদিয়া। তার কাছাকাছি ধনপতও বসে। শুধে

'তোমার শরীরের যা হাল, দুধলিগঞ্জে যেতে পারবে তো ?'

'যেতে আমাকে হবেই। কাম না জুটলে খাব কী, থাকব কোথায় ?' করুণ গলায় চাঁদিয়া বলতে থাকে, 'আমার জন্যে তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে—না ?'

ধনপত বলে, 'না না, দেরি আর কি।'

'বেশিক্ষণ বসব না, কষ্টটা একটু কমলেই আবার হাঁটতে পারব। তুমি কি চলে যাবে ?' চাঁদিয়া ধনপতের চোখের দিকে তাকায়।

তার মনোভাবটা বুঝতে পারে ধনপত। ভরসা দেবার সুরে বলে, 'না না, তোমাকে ফেলে আমি যাচ্ছি না।'

কিছুক্ষণ জিরিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে দু'জনে। তাড়াতাড়ি দুধলিগঞ্জে পৌঁছবার জন্য জোরে জোরে পা ফেলতে থাকে চাঁদিয়া। কাজ পাওয়ার ব্যাপারে তার মধ্যে মারাত্মক এক উদ্বেগ চলছে খুব সম্ভব। ধনপত বলে, 'আস্তে আস্তে চল। তখন বললে, সন্ধে'পর্যন্ত হাটিয়া চলে। বহোত সময় আছে।'

চলার বেগ খানিকটা কমিয়ে দেয় চাঁদিয়া। কিন্তু আরো সিকি রশি যাবার পর আবার তাকে বসে পড়তে হয়।

এইভাবে জিরিয়ে জিরিয়ে, প্রায় ধুঁকে ধুঁকে শেষ পর্যন্ত যখন তারা দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় পৌঁছোয় তখন সূর্য খাড়া মাথার ওপর চলে এসেছে।



পঞ্চাশ ষাট মাইলের ভেতর দুধলিগঞ্জের মতো এত বড় হাটিয়া বা হাট আর নেই। সপ্তাহে দু'দিন ওখানে হাট বসে। বুধবার এবং রবিবারে। আজ রবিবার।

বরখা নদীর পাড়ে মাইল খানেক জায়গা জুড়ে দুধলিগঞ্জের হাট বসে। এখানে না পাওয়া যায় কী? তামাক মরিচ ধান গেঁহু কাপড়া থেকে গৈয়া বকরি ভৈস পর্যন্ত মানুষের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কিছু।

যেদিকেই তাকানো যাক, সারি সারি হাটিয়ার চালা আর মানুষ। কমসে কম লাখ খানেক মানুষ তো হবেই।

এই দুপুরবেলায় হাট একেবারে জমজমাট, চারপাশ গমগম করছে। এধারে ওধারে তাকাতে তাকাতে দিশেহারা হয়ে পড়ে ধনপত।

চাঁদিয়া বলে, 'চল, ওধারে যাই—' সে ডান দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়।

ধনপত শুধোয়, 'ওদিকে কী?'

চাঁদিয়া জানায়, দক্ষিণ দিকে হাটের শেষ মাথায় অনেকগুলো কড়াইয়া আর পিপর গাছ গা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওখানে মরসুমী ক্ষেতমজুররা গাছ তলায় গিয়ে বসে থাকে। জমিমালিকরা তাদের ভেতর থেকে কাজের লোক বেছে নিয়ে যায়। চাঁদিয়া আগেও বার কয়েক এখানে এসেছে বলে দুধলিগঞ্জের খুঁটিনাটি সব খবর জানে।

লোকজনের ভিড় ঠেলে কিছুক্ষণের মধ্যে দু'জনে কড়াইয়া এবং পিপর গাছগুলোর তলায় গিয়ে পাশাপাশি বসে পড়ে।

সেখানে আগে থেকেই বেশ কিছু পুরুষ এবং আওরত এসে বসে আছে। তাদের বেশির ভাগই আদিবাসী সাঁওতাল ওরাঁও এবং মুণ্ডা। প্রায় সবগুলো মেয়েমানুষের কোলেই বাচ্চাকাচ্চা রয়েছে, তারা মায়েদের বুক ধামসাচ্ছে।

কড়াইয়া এবং পিপর গাছগুলোর মুখোমুখি তিন-চারটে হাটের চালা। সেখানে বাঁশের কয়েকটা বেঞ্চি পাতা রয়েছে। চাঁদিয়া জানালো, জমিমালিকরা ক্ষেতমজুর খোঁজার জন্য ওখানে এসে বসে। কিন্তু চালাগুলো এই মুহূর্তে ফাঁকা, কাউকেই সেখানে দেখা যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ বসে থাকার পরও কেউ যখন মরসুমী কিষাণের খোঁজে আসে না তখন চাঁদিয়াকে খুবই চিন্তিত দেখায়। সে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়েই যেন বলে, 'কা হুয়া, কেউ তো এখনও আসছে না। না এলে, কাম না জুটলে কী হবে আমাদের?'

এদিকে পাশের একটা মধ্যবয়সী রোগা দুবলা চেহারার লোকের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নিয়েছে ধনপত। তার নাম রামদেওরা, জাতে গঞ্জু, বাড়ি কুশী নদীর পারে পিপরিয়া গাঁয়ে। সে-ও কাজের খোঁজে দুধলি-গঞ্জে এসেছে। ফী বছরই নাকি চাষের এবং ধানকাটাইয়ের মরসুমে সে এখানে আসে।

ধনপত শুধোয়, 'জমি মালিকরা এখানে কখন আসে?'

রামদেওরা বলে 'সুরয চড়তে না চড়তেই তো মালিকরা চলে আসে। মালুম হোতা—'

'কা?'

'ধানকাটাইয়ের জন্যে আগেই জমিমালিকরা লোক বাছাই করে নিয়ে গেছে।'

ডান পাশে একটা ভুখা চেহারার বুড়ো দুই হাঁটুর ভেতর থুতনি ঢুকিয়ে ধনপতদের কথা শুনছিল। হঠাৎ সে বলে ওঠে, 'অঘ্রাণ মাস পড়ে গেছে। এখনও কি আর ধানকাটাইয়ের লোক নেওয়া বাকি আছে? মালিকরা অনেক আগেই ঐ কাজটা শেষ করে ফেলেছে।'

ধনপতের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ পড়ে। রোজগারের যে আশা-

টুকু দেখা গিয়েছিল তা যেন এক ফুঁয়ে কেউ নিভিয়ে দিল। ঘাড় ফিরিয়ে সে বুড়োটাকে বলে, 'তা হলে এত লোক এখানে এসে বসে আছে কেন ?'

বুড়োটা জবাব দেবার আগেই রামদেওরা বলে ওঠে, 'যদি দু-একজন মালিক এসে পড়ে, তাই—' কথা শেষ না করেই সে থেমে যায়।

একসময় আকাশের ঢালু পাড় বেয়ে সূর্যটা পশ্চিম দিকে নামতে শুরু করে। রোদের রঙ বদলাতে থাকে।

সেই কোন সকালে খানিকটা ঘাটো আর রাঙা আলু সেদ্ধ খেয়েছিল ধনপত। তারপর বালির ওপর পাক্কা দু মাইল হেঁটে দুধলিগঞ্জে পৌঁছেছে। এখানে আসার পরও বেশ খানিকটা সময় কেটে গেছে।

ধনপত পাহাড়ের মতো জোয়ান ছেলে। ঐ সামান্য খাদ্যে তার কী-ই বা হয়। পেটের ভেতর নতুন করে খিদেটা আগুনের মতো গনগন করতে থাকে। একবার চাঁদিয়ার দিকে তাকায় সে। নিশ্চয়ই তারও খিদে পেয়েছে কিন্তু সে কথা জিজ্ঞেস করলে লজ্জায় সঙ্কোচে মেয়েটা শুধু 'নহী নহী' করবে।

ধনপত তার পুঁটুলিটা চাঁদিয়ার হাতে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'এটা রাখো, আমি হাটিয়া থেকে ঘুরে আসছি।'

হঠাৎ ধনপতের হাটে যাবার কী কারণ ঘটল, বুঝতে পারে না চাঁদিয়া। জানার জন্য প্রবল কৌতূহল বোধ করে সে কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করে না।

কিছুক্ষণ পর হাটের ভেতর থেকে ফিরে আসে ধনপত। তার হাতে দুটো মাটির খোরায় চা আর সস্তা লাল আটার পাঁউরুটি। চা এবং পাঁউরুটির ভাগ চাঁদিয়াকে দিয়ে গোগ্রাসে নিজের রুটিটা চিবুতে থাকে।

খেতে খেতে ধনপত শুধোয়, 'আমি যতক্ষণ হাটিয়ায় ছিলাম, তার ভেতর কোন জমিমালিক এসেছিল ?'

'নহী—'

ধনপতের কপালে ভাঁজ পড়ে। সে বলে, 'তব্ তো বহোত মুসিবত হো যায়গা।'

এই অচেনা অনাত্মীয় পুরুষটির প্রতি কৃতজ্ঞতার শেষ নেই চাঁদিয়ার। বাঁচিয়ে তোলা পর নিজের ভাগ থেকে অনবরত খাবার দেওয়া পর্যন্ত এ যাবত যা যা ধনপত করেছে তাতে চোখে জল এসে যায়।

ধনপত কী উদ্দেশ্যে 'মুসিবত' কথাটা বলেছে তা বুঝতে অসুবিধ হয় না চাঁদিয়ার। এক ঢোক চা খেয়ে সে বলে, 'হাঁ।'

'জমিমালিকরা না এলে কাম মিলবে না। তখন কী করব আমরা?'

চাঁদিয়া চুপ করে থাকে। তার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

ধনপত আবার বলে, 'আমি একটা পুরুখ (পুরুষ)—জওয়ান আদমী, যেখানে সেখানে পড়ে থাকতে পারি। লেকেন মুসিবত তোমাকে নিয়ে। আওরতের চারপাশে বহোত খতরা (বিপদ)।'

ধনপত তার জন্য যথেষ্ট করেছে। নিজের জন্য তাকে আর আটকে রাখা ঠিক না। মুখ নামিয়ে বিমর্ষ গলায় চাঁদিয়া বলে, 'কাম না মিললে তুমি চলে যেও। আমার যা হবার হবে।'

ধনপত হঠাৎ যেন ক্ষেপেই ওঠে, 'একবার লাকরারা তোমাকে ছিঁড়ে খেয়েছে। দুনিয়ায় আরো লাখ লাখ লাকরা রয়েছে। তারা তোমাকে আবার ছিঁড়ে খাক—তা-ই চাও?'

ধনপতের রাগটা বড় ভাল লাগে চাঁদিয়ার। এমন করে তার জন্য কেউ কখনও চিন্তা নি। বাপ-মা নিশ্চয়ই তার বিষয়ে ভেবেছে কিন্তু তারা বেজায় গরীব, খুবই অসহায়। আবছা গলায় সে বলে, 'নহী। লেকেন—'

'লেকেন কা?'

'কী করব আমি? কোথায় যাব?'

চাঁদিয়ার কথা শেষ হতে না হতেই কোত্থেকে চার পাঁচটা লোক এসে পড়ে। তাদের কারো পরনে ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি, পায়ে পুরু চামড়ার নাগরা, মাথায় মোটা টিকি এবং কাঁধে আনকোরা নতুন

গামছা। কারো গায়ে ফুর প্যাণ্ট, দামী জামা।

এদের মধ্যে যার বয়স সব চাইতে বেশি তার চেহারাটা ঘাড়ে গর্দানে ঠাসা, নাম মুনোয়ারপ্রসাদ। বাঁ হাতের তেলোয় খৈনি ডলতে ডলতে সে ধনপতদের কাছে এগিয়ে আসে। খুব নরম গলায় বলে, 'কা রে, তোরা সব কামের খোঁজে বসে আছিস ?'

ধনপতেরা সবাই নড়েচড়ে বসে। সেই দুপুর কিংবা তার আগে থেকে এতগুলো লোক যে জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সেই কাম্য বস্তুটি কি শেষ পর্যন্ত হাতের কাছে চলে এসেছে ? সবাই একসঙ্গে সায় দেয়, 'হাঁ হুজৌর।' ধনপতরা মুনোয়ারপ্রসাদকে বড় জমিমালিক ভেবে নিয়েছে।

এবার মুনোয়ারপ্রসাদ গাছতলার মানুষগুলোকে গুনতে শুরু করে, 'এক, দো, তিন, চার……বিশ…পচাশ‥ একশ এক…একশ দো…একশ দশ…' গোনা হয়ে গেলে বলে, 'তোদের সবাইকে আমার দরকার।'

গোটা জটলাটা আচমকা উত্তেজনায় হৈ চৈ বাধিয়ে দেয়। বলে, 'আমরা কাম পাব হুজৌর ?'

'জরুর। বহোত বঢ়িয়া কাম।' মুনোয়ারপ্রসাদ বলতে থাকে, 'দো চার রোজকে লিয়ে নহী, কমসে কম ছে মাহিনাকা কাম—হাঁ।'

গরীবের চাইতেও গরীব, ভুখা, আধনাঙ্গা লোকগুলো প্রথমটা একেবারে তাজ্জব বনে যায়। একটানা ছ মাসের জন্য পেটের চিন্তা থাকবে না, এমন ঘটনা তাদের জীবনে একেবারেই অবিশ্বাস্য। আজ পেটের দানা জুটলে, কালই যাদের উদভ্রান্তের মতো খাদ্যের খোঁজে ছুটতে হয় তাদের কাছে এ কোন অপার্থিব স্বপ্নের মতো।

রামদেওরা অবাক বিস্ময়ে প্রায় চেঁচিয়েই ওঠে, 'একসাথ ছে মাহিনাকা কাম !'

'হাঁ।' মুনোয়ারপ্রসাদ জানায়, শুধু ছ মাসের কাজই না, মজুরি যা মিলবে তা তারা ভাবতেও পারে না। হর রোজ মাথাপিছু এই লোকগুলোকে দশ টাকা করে দেওয়া হবে।

এখানে যে আদিবাসী বা অচ্ছুতেরা জমা হয়েছে, তাদের চোদ্দ পুরুষও দৈনিক দশ টাকা কামাইয়ের কথা চিন্তা করতে পারত না। বিস্ময়ে তারা একেবারে হাঁ হয়ে যায়।

এতগুলো মানুষের লোভ এবং আশাকে আরো খানিকটা উসকে দেয় মুনোয়ারপ্রসাদ, 'মজুরি ছাড়াও রোজ খোবাকি পাবি। একটা পাইসাও তোদের খরচা নেই। রোজ পুরা দশগো করে রুপাইয়া তোদের জমবে—হাঁ।'

'মুনোয়ারপ্রসাদ যেন কোন অকল্পনীয় স্বপ্নের জগৎ থেকে সুখ আর আরামের খবর নিয়ে সিধা এই তুধনিগঞ্জের হাটিয়ায় নেমে এসেছে। শ্বাসরুদ্ধের মতো তারা বলে, 'সচ্?'

'সচ্ না তো কা ঝুট? মুনোয়ারপ্রসাদ তিওয়ারীর গলার নলিয়া দিয়ে কোনদিন ঝুট বেরোয় না। কভী নহী।' বলতে বলতে একটু থামে মুনোয়ার। পরক্ষণেই আবার শুরু করে, 'ছে মাহিনায় এক এক আদমী কেত্তে পাইসা জমাতে পারবি, একবার মনে মনে হিসেব করে দ্যাখ।'

ছ'মাস রোজ মাথাপিছু দশ টাকা করে পেলে মোট কত টাকা হয়, এত বিরাট একটা অঙ্ক কষতে লোকগুলো একেবারে হিমসিম খেয়ে যায়। একদিনের মজুরিই যারা জমাতে পারে না তাদের পক্ষে ছ মাসের হিসেব কষা অসম্ভব ব্যাপার। ভিড়ের ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, 'আপনিই হিসেব করে দিন হুজৌর—'

হাতের চেটোয় খৈনি ডলা হয়ে গিয়েছিল। মুনোয়ারপ্রসাদ তার সঙ্গীদের এক চিমটি করে দিয়ে বাকিটা নিচের ঠোঁটের তলায় গুঁজে খানিকক্ষণ আরামে চোখ বুজে থাকে। তারপর পিচিক করে খয়েরি রঙের খানিকটা থুতু ফেলে বলে, 'এত তাড়াহুড়োর কী আছে, কাম কাজ চালু কর। পরে হিসেব করে দেব।'

কেউ আর কোন প্রশ্ন করতে সাহস করে না।

মুনোয়ার কি ভেবে বলে, 'ছে মাহিনায় লগভগ এক এক আদমীর দেড় দো হাজার জমে যাবে।'

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় দম আটকে আসে ধনপতের। ছ মাসে দেড় দু হাজার টাকা! তা হলে বছর খানেক খাটলেই জনমদাসের জীবন থেকে বাপ-মা-ভাইবোন সবাইকে সে মুক্ত করে আনতে পারবে। মোটে একটা বছর! তারপর পৃথিবীর আর সব স্বাধীন মানুষের মতোই তারা মর্যাদা এবং সম্মান পাবে। চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানেরা লাঠি ঠুকে তাদের বেগার খাটাতে নিয়ে যাবে না।

অনেকক্ষণ পর জোরে শ্বাস টানে ধনপত। মুক্তির আগাম আনন্দে তার হৃদ্‌পিণ্ড প্রবল বেগে উথল পাথল হতে থাকে।

জটলার মধ্যে বসে রামদেওরা কি ভাবছিল। আচমকা সে শুধোয়, 'ছে মাহিনার কামের কথা বলছেন তো হুজৌর—'

'হাঁ। এতক্ষণ তা হলে শুনলি কি?' দ্বিতীয় বার খৈনির পিচকি ফেলে মুনোয়ারপ্রসাদ।

রামদেওরা বলে, 'লেকেন সরকার—' তার মনে কোথায় যেন একটা খটকা দেখা দিয়েছে।

'লেকেন কী?' সবাসবি রামদেওরার চোখের দিকে তাকায় মুনোয়ারপ্রসাদ।

'ধানকাটাই তো ছে মাহিনা চলে না, এক দেড় মাহিনাতেই খতম হয়ে যায়।'

একটু যেন থতিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলে, 'ধানকাটাইয়ের জন্যে তোদের নিতে আসি নি।'

'তব্?'

'জঙ্গলকাটাইয়ের জন্যে।'

এতক্ষণে বোঝা যায়, মুনোয়ারপ্রসাদ বড় জমি মালিক নয়। সে অন্য উদ্দেশ্যে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় এসেছে।

ভিড়ের পেছন দিক থেকে একটা হট্টাকট্টা চেহারার লোক বলে ওঠে, 'কঁহা হোগা জঙ্গলকাটাই?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'সাহারাসাকা নাম শুনা হ্যায় কভী?'

সবাই মাথা নাড়ে—শুনেছে।

মুনোয়ারপ্রসাদ এবার বলে, 'ইঁহাসে হোগা ষাট পঁয়ষট মিল।' ওখানে জঙ্গল কাটতে যেতে হবে। পেঁড় উড় (গাছপালা) সাফাইয়ের পর বহোত ভারী কারখানা বসবে। সমঝা?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলতে থাকে, 'কোঈ চিন্তা নহী। ওখানে ঘর তুলে রেখেছি। বর্তন উর্তন (বাসন কোসন), বিস্তারা (বিছানা), হেরিকেন, মিট্টি তেল আউর চুলহা ভি হ্যায়। সিরিফ আপনা হাত-পা নিয়ে গেলেই চলবে। ওখানে পৌঁছেই দেখতে পাবে, সব কিছু 'রিডি'।' 'রিডি' মানে রেডি।

এত সব অকল্পনীয় সুযোগ সুবিধার কথা শুনবার পরও কেউ কিছু বলে না। মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, দূরে যাবার নামে লোকগুলো দ্বিধাগ্রস্ত।

মুনোয়ারপ্রসাদ জটলাটার ওপর দিয়ে দ্রুত একবার দু চোখ ঘুরিয়ে নেয়। লোকগুলোর মুখটুখ দেখে তাদের মনোভাব সে আন্দাজ করতে পারে,। এরা যেতে না চাইলে তার খুবই বিপদ।

আসলে মুনোয়ারপ্রসাদ একটা আড়কাঠি। ঠিকাদারদের মজুর জুটিয়ে দেবার বদলে সে প্রচুর 'কমিশন' পেয়ে থাকে। কিন্তু মুশকিল হয়েছে কাজের লোকদের নিয়ে। এ অঞ্চলের আনপড় ভূমিহীন মানুষেরা এমনই ঘরকুনো যে না খেয়ে ভুখা মরতে রাজী কিন্তু কিছুতেই দূরে যেতে চাইবে না। কী কষ্টে, কত লোভ টোভ দেখিয়ে যে এদের ফাঁদে ফেলতে হয় তা শুধু মুনোয়ারপ্রসাদই জানে। হাত-পা-মুখ-মাথা নেড়ে, গলার স্বর কখনও উঁচুতে তুলে, কখনও খাদে নামিয়ে সে বলতে থাকে, 'ওখানে গেলে বঢ়িয়া ভোজন মিলবে। রোজ রাত্তিরে নওটঙ্কী লাগিয়ে দেব, গানা শুনতে পাবি। আরামে থাকবি। তা হলে বাত পাক্কী হয়ে গেল।'

তবু সংশয় কাটে না লোকগুলোর। একজন বলে, 'লেকেন হুজৌর—'

দু হাত প্রচণ্ডভাবে নাড়তে নাড়তে মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'লেকেন টেকেন কুছ নহী।' বলেই বুক পকেট থেকে সুতোয় বাঁধা ঢাউস একটা

ঘড়ি বার করে, 'দো বাজকে বিশ। সাড় চারটেয় টিরেন হ্যায়। তুরন্ত সব উঠে পড়। হোটেলে ভাত-মাংস খাইয়ে তোদের টিরেনে তুলব। ওঠ-ওঠ—'

ভাত-মাংসের নামে এবং আরামে থাকার লোভে বেশির ভাগই উৎসাহিত হয়ে ওঠে। তবে বিশ তিরিশ জন একেবারে বেঁকে বসে।

মুনোয়ারপ্রসাদ বোঝাতে থাকে, এক শো দেড়শো মাইল কতটা আর দূর! ট্রেনে উঠলে চার পাঁচ ঘণ্টায় পৌছে যাবে। ইচ্ছা হলেই তারা যখন ইচ্ছা ফিরে আসতে পারবে। কিন্তু ওখানে গেলে যা মিলবে —টাকা পয়সা, আরাম, সুখ, বঢ়িয়া খাদ্য—এমনটা দুনিয়ার আর কোথাও পাবে না। বোকামি করে কেউ যেন এই সুযোগ না হারায়। নইলে পরে পস্তাতে হবে।

এতেও ঐ বিশ তিরিশ জনকে টলানো যায় না। তারা নিজেদের প্রতিজ্ঞায় অনড় থাকে।

এদিকে নীচু গলায় ধনপত আর চাঁদিয়া নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। ধনপত শুধোয়, 'কী করবে? সাহারসায় যাবে, না অন্য কামের ধান্দা করবে?'

চাঁদিয়া জানায়, এই মুহূর্তে অন্য কাজ আর কোথায় জুটবে? হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছে সেটা নেওয়াই ভাল।

ধনপত বলে, 'পাইসা কামাইয়ের জন্যে বেরিয়েছি। যেখানে পাইসা সেখানেই চলে যাব। জরুরত হো যায় তো দুনিয়ার শেষ মাথায় যেতেও রাজী।'

'ঘরে ফিরতে পারব না। যেখানে পেটের দানা মিলবে সেখানেই তো যেতে হবে।'

ঘরে ফেরা সম্বন্ধে চাঁদিয়ার মতো অতখানি হতাশ নয় ধনপত। তার বিশ্বাস, টাকাপয়সা রোজগার করে একদিন না একদিন সে ধুরুয়া গাঁয়ে ফিরে আসতে পারবে। যাই হোক, সাহারসা যাবার ব্যাপারে দু'জনে একমত হয়ে যায়।



শেষ পর্যন্ত মোট ছিয়াত্তর জন মুনোয়ারপ্রসাদের সঙ্গে সাহারসা যেতে রাজী হয়। কথাবার্তা পাকা করে তাদের নিয়ে মুনোয়ার এবং তার সঙ্গীরা সোজা চলে যায় হোটেলে। সপ্তাহে দু'বার হাট বসে বলে দুধলিগঞ্জে তিন চারটে স্থায়ী ভাত-রুটির হোটেল আছে।

ভাত ডাল সবজি এবং মাংস দিয়ে একটা উৎকৃষ্ট 'ভাতকা ভোজন' করিয়ে ছিয়াত্তর জনকে আধ মাইল দূরের রেল স্টেশনে নিয়ে যায় মুনোয়ারপ্রসাদ। ট্রেনে ওঠার আগে সবাইকে হাত-খরচ বাবদ পাঁচ পাঁচটা করে টাকা দেয়।

চারটে দশে ট্রেন আসার কথা। প্রায় দেড় ঘণ্টা 'লেট' করে ট্রেনটা এল সাড়ে পাঁচটায়।

সবাইকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে একটা মোটামুটি ফাঁকা কামরায় তুলে ফেলল মুনোয়ারপ্রসাদ এবং তার দলের লোকেরা। ওরা উঠতে না উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

জানালার ধারে মুখোমুখি বসার জায়গা পেয়েছিল ধনপত আর চাঁদিয়া।

কয়লার ইঞ্জিন গল গল করে বাতাসে কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ছুটে চলেছে। দু ধারের দৃশ্যাবলী কিছুই এখন স্থির নেই। গাছপালা, ধানের ক্ষেত, মজা নহর, টেলিগ্রাফের থাম, সব কিছু ঊর্ধ্বশ্বাসে পেছন দিকে সরে সরে যাচ্ছে।

শীতের রোদ নিভে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগেই। সূর্যটাকে

আকাশের কোথাও এখন আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পছিমা দিগন্তের নিচে কখন যে সেটা নেমে গেছে, কে জানে। সমস্ত চরাচর জুড়ে শীতের ঝাপসা সন্ধ্যা দ্রুত ছড়িয়ে যাচ্ছে। বাতাসে লক্ষ কোটি হিমের সূক্ষ্ম দানা মিশতে শুরু করেছে। থেকে থেকে উল্টোপাল্টা উত্তুরে হাওয়ার একেকটা ঝলক চামড়ায় যেন ছুরি চালিয়ে দিচ্ছে।

একসময় জানালার কাচ নামিয়ে দেয় ধনপত। তাতে হাওয়াটা ঠেকানো গেলেও ঠাণ্ডা খুব একটা কমে না। কামরাসুদ্ধ সবাই হি হি কাঁপতে থাকে। পরনে সামান্য যেটুকু আচ্ছাদন রয়েছে সেটুকু টেনেটুনে গায়ে ভাল করে জড়িয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেছে তারা।

ওধারের একটা বেঞ্চে দু পা তুলে বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে গাঁজার কল্কের মতো করে এক টানে অর্ধেকটা পুড়িয়ে ফেলে মুনোয়ার-প্রসাদ। হুস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গোটা কামরাটা আস্তে আস্তে দেখে নেয়। চুক চুক করে সহানুভূতির সুরে বলে, 'বহোত জাড়। তোদের বড় তখলিফ।'

কেউ উত্তর দেয় না; শুধু মুনোয়ারপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুনোয়ার দ্বিতীয় টানে সিগারেটটা শেষ করে ফের ধোঁয়া ছেড়ে বলে, 'সাহারসায় গেলে তোদের তখলিফ আর থাকবে না। সবার জন্যে কম্বলের ব্যবস্থা আছে সেখানে।' একটু থেমে ফের বলে, 'আমার কাজে ফাঁকি পাবি না। সবদিকে আমার নজর আছে—হাঁ। যাদের কামে লাগাব তাদের সুখ-আরাম দেখব না, আমার কাছে সেটি হবে না।'

অনেকেই বলে, 'আপহীকা কিরপা—' কম্বলের প্রতিশ্রুতি পেয়ে তারা মোটামুটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ওদের কারোই গরম জামা কাপড় নেই। বিহারের অসহ্য শীতে ফী বছরই 'ঘুর' (আগুনের কুণ্ড) জ্বেলে তার পাশে শুয়ে তাদের শরীর উত্তপ্ত রাখতে হয়। এই প্রথম তারা কম্বল পেতে চলেছে। মুনোয়ার-প্রসাদের মহানুভবতায় ছিয়াত্তরটা পুরুষ এবং আওরত একেবারে অভিভূত হয়ে যায়।

ট্রেন যত এগুচ্ছে ততই মন খারাপ হতে থাকে ধনপতের। প্রথম

।কের সেই আশা এবং উৎসাহ ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়। ধুরুয়া এবং ।র আশেপাশের বিশ বাইশটা গাঁয়ের বাইরে এর আগে আর কখনও ক্যাথাও যায় নি সে। নিরানন্দ মুখে বলে. 'ঘরমুল্লুক থেকে কেত্তে র চলে যাচ্ছি—' বলতে বলতে থেমে যায়।

অস্ফুট গলায় চাঁদিয়া কি জবাব দেয়, বোঝা যায় না।

ধনপত অবার বলে, 'মা-বাপের সঙ্গে আর দেখা হবে কিনা, ‹ক ।নে।'

চাঁদিয়া এবার বলে, 'তখন যে বললে পাইসা কামাই করে জমি-।লিকের কাছ থেকে মা-বাপ-ভাইবোনকে ছাড়িয়ে আনবে। গাঁওয়ে ফবলে তাদের সঙ্গে তো দেখা হবেই।'

ধনপত বলে, 'বলেছিলাম ঠিকই। লেকেন—' কথাটা আর শেষ ːরে না সে।

তার মনোভাব বুঝতে পারে চাঁদিয়া। সেও আর কোনো প্রশ্ন ꞏরে না।

বাইরের হিম এবং অন্ধকারের মতো কামরার ভেতরেও ঘন হয়ে বিষাদ নামতে থাকে।



মুনোযারপ্রসাদ জানিয়েছিল মাঝ রাতে তারা পৌঁছে যাবে। কিন্তু অনেব জায়গায় লাইন ক্লিয়ার না পেয়ে, থেমে থেমে এবং ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে শে পর্যন্ত যখন ডুমনিগাঁও স্টেশনে ট্রেনটা পৌঁছুল, ভোর হয়ে গেছে। রো অবশ্য ওঠে নি। কুয়াশায় চারদিক ঝাপসা হলেও আকাশের গা আলোর আভা ফুটতে শুরু করেছে।

তাড়িয়ে তাড়িয়ে যেভাবে মুনোয়ারপ্রসাদ লোকগুলোকে গাড়িতে তুলেছিল ঠিক সেইভাবেই গাড়ি থেকে নামালো।

ডুমনির্গাঁও ছোট স্টেশন। একধারে পুরনো লাল বাড়িটা স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে শুরু করে টিকেট কাউণ্টার পর্যন্ত যাবতী কিছু। সেটার লাগোয়া টালির চালের ছোট একটা শেডের তলা 'চায় কা দুকান'। সেখানে বাজে বেকারির লাল লাল পাঁউরুটি আর বিস্কুট মেলে।

প্ল্যাটফর্ম বলতে দু ধারে উঁচু খানিকটা করে জমি। তার পর থেকেই ফসলের মাঠ শুরু হয়েছে। যতদূর চোখ যায় ধু ধু প্রান্তর। ফাঁকে ফাঁবে প্রচুর গাছপালা আর দু-একটা হতচ্ছাড়া চেহারার দেহাতী গাঁ।

নির্জন দ্বীপের মতো এই ডুমনিগাঁও স্টেশনে ধনপতরা ছিয়াত্তর জন এবং মুনোয়ারপ্রসাদের দলটা ছাড়া আর কেউ নামে নি। তারা নামার পর ট্রেনটা এক মুহূর্তও দাঁড়ায় না, ঝুক ঝুক করতে করতে ডিসট্যান্ট

গন্তাল পেরিয়ে দূরের বাঁক ঘুরে ধানক্ষেতের ভেতর দিয়ে ক্রমশ দৃশ্য হয়ে যেতে থাকে।

এদিকে মুনোয়ারপ্রসাদ অনবরত তাড়া দিতে দিতে ধনপতদের য়কা দুকান'টায় নিয়ে আসে। বলে, 'পয়লে চায়-পানি পী লে, পিছা নরি বাত।'

ধনপতরা আগে লক্ষ করে নি, প্ল্যাটফর্মটা ফাঁকা হলেও চায়ের াকানে আট দশটা লোক বসে আছে।

লোকগুলোর কারো পরনে খাটো ধুতি এবং মোটা কাপড়ের জামার পর কম্বল জড়ানো। কেউ কেউ ফুর প্যান্ট আর রোঁয়াদার উলের ায়েটার পরেছে। মাথায় সবারই কান-ঢাকা গরম টুপি। নাকের ডগা, াট এবং চোখ দুটো ছাড়া তাদের আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

মুনোয়ারপ্রসাদ এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখে চায়ের দোকানের লোকগুলো উঠে দাঁড়ায়। তাদের মধ্যে ফুর প্যান্ট-পরা মধ্যবয়সী কটা লোক বলে, 'আ গিয়া তুমলোগন—'

বোঝা যায়, এই লোকগুলো মুনোয়ারপ্রসাদের জন্য অপেক্ষা করছে।

মুনোয়ারপ্রসাদ মাথা নাড়ে, 'হাঁ মিশিরজি—'

'কাল রাত্তিরে তোমাদের পৌঁছুবার কথা। সেই থেকে আমরা খানে বসে আছি। এত্তে দেরি হল যে?'

'কা করে। টেরেন জ্যাদা লেট কিয়া।'

'পুরা রাত জাড়ে (ঠাণ্ডায়) আর মচ্ছরের কামড়ে জান চৌপট হো য়া।'

'কা করে মিশিরজি, রেল কোম্পানির ওপর আমার হাত নেই। রেন আপনা মর্জিসে চলে। কারো সুবিধা-অসুবিধা থোড়াই পরোয়া রে। আপনাদের তকলিফের জন্যে মনমে বহোত দুখ হোতা হ্যায়।' নোয়ারপ্রসাদের কথাবার্তার ধাঁচ শুনে টের পাওয়া যায়, মিশিরজি মে এই লোকটাকে বেশ খাতিরদারিই করে সে।

'ঠিক হ্যায়—'মিশিরজি মাথা নাড়ে। অর্থাৎ মুনোয়ারপ্রসাদের থাটাকেই সে মেনে নেয়—রেল কোম্পানির মর্জি-মেজাজের ওপর

কারো হাত নেই। পরক্ষণেই তার চোখ গিয়ে পড়ে ধনপতদের ওপর দ্রুত তাদের দেখে নিয়ে মোটামুটি সংখ্যাটা আন্দাজ করে নেয়। বলে 'এ কা! শও আদমীও তো আনতে পার নি। তোমাকে বলে দিয়েছিলাম, কমসে কম তিন চার শো আদমী লাগবে। এত্তে বড় জঙ্গল কাটাই হবে কি করে ?'

চোখের কোণ দিয়ে দ্রুত একবার ধনপতদের দেখে নেয় মুনোয়ার প্রসাদ। তারপর ইশারায় মিশিরজিকে দূরে ডেকে নিয়ে গি চাপা গলায় বলে, 'এ ক'জনকে জোটাতেই বহোত তখলিফ হয়েছে চিন্তা নায় করনা। দশ রোজের মধ্যে বাকি আদমী জরুর পে যাবেন।'

'দশ রোজের বেশি দেরি করো না। সাহাবরা জোর তাগা লাগাচ্ছে।'

'ঠিক হ্যায়। সাহাবদের আমার কমিশনের পাইসাটা থোড়ে বাড়িয়ে দিতে বলবেন।'

'কাম ঠিক মতো কর। পাইসার জন্যে চিন্তা করতে হবে না সমঝা ?'

'সমঝ গিয়া। অব্ উধর চলিয়ে—'

ফের চায়ের দোকানে ফিরে এসে মুনোয়ারপ্রসাদ দোকানদারে বলে, 'হর আদমীকো চায় আউর এক এক পাঁও দেও।'

ডুমনিগাঁও স্টেশনের টিমটিমে হতচ্ছাড়া চেহারার চা দোকানে মালিক এত বড় 'অর্ডার' সারা জীবনে আর পেয়েছে কিনা মনে করে পারে না। মুহূর্তে প্রচণ্ড ব্যস্ততা শুরু হয়ে যায়।

চা-রুটি খাবার পর মুনোয়ারপ্রসাদ আনুষ্ঠানিকভাবে মিশিরজি সঙ্গে ধনপতদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলে, 'এই হচ্ছে আসল লোক জঙ্গল কাটাইয়ের জায়গায় মিশিরজি তোদের নিয়ে যাবে। বহো আচ্ছা আদমী—সব দিকে এর নজর। তোদের দেখ-ভাল করবে কোঈ চিন্তা নহী।'

একে তো মুনোয়ারপ্রসাদ তাদের সম্পূর্ণ অচেনা। তবু কাল দুপু

থেকে আজকের এই সকাল পর্যন্ত একসঙ্গে কাটিয়ে লোকটাকে খারাপ লাগে নি, বরং তাদের সম্পর্কে বেশ সহানুভূতিপ্রবণই মনে হয়েছে। কথায় বার্তায় মমতা ঝরে ঝরে পড়ে তার। কিন্তু মিশিরজি লোকটা কেমন, কে জানে। মিশিরজির হাতে তুলে দিয়ে মুনোয়ারপ্রসাদ কোন অনিশ্চয়তার দিকে তাদের ঠেলে দিচ্ছে, তাই বা কে বলবে। সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে।

রামদেওরা বলে, 'আপ হামনিকো সাথ নহী যায়েগা?'

মুনোয়ারপ্রসাদ বলে, 'আমি পরে যাব। তোমরা মিশিরজির সঙ্গে চলে যাও। কোঈ চিন্তা নহী।'

'ফির কখন আপনার সঙ্গে দেখা হবে?'

'সামকো (সন্ধ্যে বেলায়)।'

রামদেওরা আর কোন প্রশ্ন করে না। তারা জানে না, মুনোয়ার-প্রসাদের সঙ্গে জীবনে আর কখনও দেখা হবে না। বিহারের নানা জায়গা থেকে মজুর জুটিয়ে এনে ডুমনির্গাঁও স্টেশনে পৌঁছে দেওয়া পর্যন্তই তার কাজ। মিশিরজির কাছে এইসব লোকের দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারলেই তার ভূমিকা শেষ। লেবার কনট্রাক্টরদের খাতায় মজুর সাপ্লাই বাবদে তার নামে মোটা টাকার কমিশন লেখা হবে।

এদিকে কুয়াশা কেটে যেতে শুরু করেছে। অঘ্রাণ মাসের সূর্য রক্তাভ মাথা তুলে আস্তে আস্তে দিগন্তের তলা থেকে উঠে এসেছে। হু হু করে উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দু ধারের গাছপালা নহর শস্যক্ষেত্র ইত্যাদির ওপর দিয়ে।

এবার আর মুনোয়ারপ্রসাদ নয়, মিশিরজিই তাড়া লাগায়, 'আর বসে থাকতে হবে না। ওঠ ওঠ, উঠে পড় সব। টিশনের বাইরে গাড়িয়া রয়েছে।'

ধনপতেরা আগে লক্ষ করে নি। এখন তাদের চোখে পড়ে দশ দশটা ভৈসা গাড়ি স্টেশনের বাইরের কাচ্চীতে অর্থাৎ কাঁচা মাটির রাস্তায় কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিশিরজি এবং তার সঙ্গীরা ধনপতদের গাড়িতে তুলে দেয়। মুনোয়ার-

প্রসাদ তার সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে ফাঁকা স্টেশনে বসে থাকে।

কিছুক্ষণ পর দশটা গাড়ির বিশটা চাকায় ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করতে করতে ভৈসা গাড়িগুলো চলতে শুরু করে। ভৈসোয়াররা তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুর্‌র্‌ চুর্‌র্‌ শব্দ করতে করতে মাঝে মাঝে মোষগুলোর গায়ে খোঁচা মেরে চলার বেগ বাড়িয়ে দেয়।

দু ধারে মাইলের পর মাইল ধানের ক্ষেত। মাঝখান দিয়ে আঁকা-বাঁকা কাঁচা সড়কে ভৈসা এবং বয়েল গাড়ির চাকার অগুণতি দাগ।

একটা গাড়ির ছইয়ের তলায় আরো সাত-আট জনের সঙ্গে বসে আছে ধনপত এবং চাঁদিয়া। কেউ কথা বলছে না। নির্জন ফসলের মাঠের ওপর দিয়ে ভৈসা গাড়িগুলো পৃথিবীর কোন সুদূর প্রান্তে তাদের নিয়ে চলেছে কে জানে।



দিনটা যখন দুপুর এবং বিকেলের মাঝামাঝি জায়গায় থমকে আছে ঠিক সেই সময় ভৈসা গাড়িগুলো একটা বিরাট জঙ্গলের কাছে এসে থামল।

প্রথম গাড়িটা থেকে নেমে মিশিরজি হাঁক দিয়ে বলে, 'আ গিয়া হামলোগন। উতার আ, উতার আ—সব কোই—'

ধনপতরা গাড়িগুলো থেকে নেমে আসে। আর নামতেই তাদের চোখে পড়ে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে সার দিয়ে টালির চাল আর চুন-সুরকির গাঁথনি-দেওয়া ইটের দেয়াল দিয়ে নীচু নীচু অগুণতি অস্থায়ী ঘর বা নিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোর কাছেই পর পর অনেকগুলো নতুন কুয়ো। সেখানে কিছু লোকজন বসে ছিল, ভৈসা গাড়িগুলো দেখে তারা ব্যস্তভাবে এগিয়ে আসে।

মিশিরজি ঐ লোকগুলোর উদ্দেশ্যে বলে, 'সব ঠিক করে রেখেছ তো?'

লোকগুলো সমস্বরে জানায়, 'হাঁ।'

এবার ধনপতদের দিকে ফিরে মিশিরজি বলে, 'চল, আগে অফিসে গিয়ে পয়লা কামটা চুকিয়ে নিই। দশ 'মিনট'কা (মিনিট) কাম। তারপর তোমাদের ভোজন উজনের ব্যওস্থা করব। আও মেরা সাথ—' বলে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। তার পেছন পেছন ধনপতরা নিঃশব্দে হাঁটতে থাকে। কাল পড়তি বেলায় দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় ভাত খাবার পর সারা রাত পেটে আর কিছু পড়ে নি। অবশ্য সকালে ডুমনিগাঁও স্টেশনে চা-পাঁউরুটি মিলেছে। কিন্তু পুরা রাত ভুখা থাকার পর ওতে

আর কী হয়। তার পরও এই বিকেল পর্যন্ত আর কিছুই জোটে নি। পেটের ভেতর এখন হু হু করে আগুন জ্বলছে সবার। তা ছাড়া ট্রেন এবং ভৈসা গাড়ির অনবরত 'গতরচুরণ' ঝাঁকানিতে শরীরে আর কিছু নেই, পা থেকে মাথা পর্যন্ত যন্ত্রণায় ছিঁড়ে পড়ছে।

সেই সারিবদ্ধ টালির ঘরগুলোর পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিশিরজি চেঁচিয়ে বলে, 'এই ঘরগুলো তোমাদের। দেখ, তোমাদের থাকার জন্যে কেমন বঢ়িয়া ব্যওস্থা করে রেখেছি।'

কেউ উত্তর দেয় না। এখন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়তে পারলে তারা বেঁচে যায়।

সারিবদ্ধ ঘরগুলোর পর খানিকটা ফাঁকা জায়গা। তারপর আবার খানকতক ঘর। এগুলো আগের ঘরগুলোর মতো চাপা আর নীচু নয়—বেশ উঁচু এবং বড় মাপের। একটা ঘরের সামনে হিন্দীতে সাইনবোর্ড লেখা আছে: 'সাইট অফিস, পিপরিয়া সিমেণ্ট ফ্যাক্টরি, পিপরিয়া, বিহার।' আনপড়, অক্ষর পরিচয়হীন ধনপতেরা অবশ্য তা পড়তে পারে না।

ঘরটা দেখিয়ে মিশিরজি বলে, 'এটা আমার হেড অফিস। যার যা দরকার হবে, এখানে এসে 'রিপোর্ট' করতে হবে—সমঝা?'

সবাই মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দেয়।

এবার মিশিরজি তার সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে ফিরে বলে, 'এ ঘন্নুয়া, চেয়ার টেবুল আর রেজিস্টারি খাতা বাইরে নিয়ে আয়।'

একটা তাগড়াই জোয়ান ছোকরা দৌড়ে গিয়ে তৎক্ষণাৎ হুকুম তামিল করে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের ইট-বসানো বারান্দায় চেয়ার টেবল এনে পেতে দেয়। একটা ঢাউস খাতা, টিনের বাক্স, দোয়াত কলম আর 'অঙ্গুঠার টিপছাপ' (বুড়ো আঙুলের ছাপ) দেবার জন্য কালির প্যাড গুছিয়ে রাখে।

মিশিরজি এক মুহূর্তেও আর সময় নষ্ট করে না। চেয়ারে বসে মোটা খাতাটা খুলতে খুলতে হাঁকে, 'সব কোঈ বৈঠ যাও। আমি যাকে যখন ডাকব সে উঠে আসবে।'

ধনপতরা চুপচাপ বসে পড়ে।

মিশিরজি এবার আরেকটা ছোকরাকে ডেকে বলে, 'কনটেরাক্টের কাগজ বার করে টিপছাপ নেবার ব্যওস্থা কর জগদেও।'

জগদেও নামধারী ছোকরাটি টিনের বাক্স থেকে অনেকগুলো ছাপানো কাগজ বার করে টেবলের ওপর সাজিয়ে কালির প্যাডটা খুলে অপেক্ষা করতে থাকে।

মিশিরজি এবার সামনের দিকে তাকিয়ে প্রথম লোকটিকে ডাকে, 'ইধর আও—'

লোক উঠে আসে। মিশিরজি শুধোয়, 'তোমার নাম কী?'

ভীরু গলায় লোকটা বলে, 'ঘমণ্ডি—'

নামটা লিখতে লিখতে মিশিবলাল প্রশ্ন করে, 'মুলুক কঁহা?'

'পূর্ণিয়া জিলা—'

'গাঁও?'

'ধরমপুর—'

প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে খোপ-কাটা ঘরে ঘরে লেখাও চলতে থাকে।

'তোমার সঙ্গে আর কে আছে?'

'আমার ঘরবালী, আউর ছোটা এক লড়কা।'

'ঘরবালীর নাম?'

'জান্‌কী।'

'সেও কাম করবে তো?'

'হাঁ।'

'তোমার জেনানাকে ডাক।'

ঘমণ্ডি এবং জান্‌কী সম্পর্কে যাবতীয় বিবরণ লেখা হয়ে গেলে মিশিরজি জগদেওকে বলে, 'কনটেরাক্ট কাগজে এদের অঙ্গুঠার ছাপ লাগিয়ে নাও।'

জগদেও আলাদা দুটো কনট্রাক্ট ফর্মে দু'জনের আঙুলের ছাপ নিয়ে নেয়। এই ফর্মটা অঙ্গীকারপত্র। এতে হিন্দীতে যা লেখা আছে তা এইরকম। 'আমি সজ্ঞানে এই অঙ্গীকার করছি যে দৈনিক মজুরিতে

পিপরিয়া সিমেন্ট কারখানার জন্য জঙ্গল কাটব। যতদিন এই কাজ চলবে ততদিন আমি এখান থেকে কোথাও যেতে পারব না।'

টিপছাপ নেওয়া হলে নিজের দলের মধ্যবয়সী একটা লোককে ডেকে মিশিরজি বলে, 'বদ্রিকা, ভাণ্ডারা থেকে এদের চাল-ডাল-আটা-নিমক-মিরচি-মিট্টি তেল—সাত রোজের জন্যে হিসেব করে দিয়ে দাও। আর দেবে লালটীন কম্বল বর্তন কড়াইয়া—সমসার করতে যা যা লাগে।' ঘন্নুয়াকে বলল, 'তুমি ওকে একটা ঘর দেখিয়ে দেবে। সেখানে ওরা থাকবে।'

বদ্রিকা এবং ঘন্নুয়া ঘমণ্ডিদের নিয়ে ওধারের একটা বড় ঘরের দিকে চলে যায়। ওটা ভাণ্ডারা বা স্টোর।

এবার ধনপতদের দিকে ফিরে অন্য একজনকে ডাকে মিশিরজি। সে উঠে এলে শুধোয়, 'নাম কা?'

লোকটা বলে, 'তৌহরলাল—'

আগের মতোই তার গাঁও মুল্লুকের ঠিকানা, সঙ্গে কে কে আছে ইত্যাদি জেনে লিখে নেয় মিশিরজি। তারপর জগদেওকে দিয়ে কনট্রাক্ট ফর্মে আঙুলের টিপছাপ লাগিয়ে বদ্রিকার সঙ্গে ভাণ্ডারায় পাঠিয়ে দেয়।

এইভাবে যান্ত্রিক নিয়মে একেক জনের ডাক পড়ে। তাদের যাবতীয় বিবরণ খাতায় লেখা হয়ে যায়, কনট্রাক্ট ফর্মে টিপসই নেওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকা আর খাওয়ার বন্দোবস্ত হয়ে যায়।

সবার শেষে বসে ছিল ধনপত এবং চাঁদিয়া। মিশিরজি হাত নেড়ে ধনপতকে ডাকে। সে কাছে এলে নাম ধাম ইত্যাদি জিজ্ঞেস করে। তারপর জানতে চায়—সঙ্গে কেউ আছে কিনা।

চাঁদিয়াকে দেখিয়ে ধনপত বলে, 'ওই আওরত আছে।'

'তোমার জেনানা?'

'নহী, নহী—' প্রায় চমকেই ওঠে ধনপত।

সোজাসুজি ধনপতের চোখের দিকে তাকিয়ে মিশিরজি সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে শুধোয়, 'তব কা?'

সঠিক কি উত্তর দেবে সেটা ভেবে বার করতে খানিকটা সময় লাগে ধনপতের। তার মধ্যে মিশিরজির সন্দেহটা আরো ঘন হয়। আবার সে প্রশ্ন করে, 'লড়কীকে ভাগিয়ে নিয়ে এসেছ নাকি?'

'নহী নহী—' নাকমুখ ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে ধনপতের।

'তা হলে আসল ব্যাপারটা কী?'

এতক্ষণে ঠিক জবাবটা খুঁজে পায় ধনপত। বলে, 'রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। কামের খোঁজে দু'জনে দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখান থেকে এখানে এসেছি।' কীভাবে কোথায় এবং কী অবস্থায় চাঁদিয়াকে সে দেখেছে, সেটা আর বিশদভাবে জানায় না ধনপত।

তার কথা পুরোপুরি হয়ত বিশ্বাস করে না মিশিরজি। তবে চাঁদিয়া প্রসঙ্গে আর কোন কৌতূহল না দেখিয়ে শুধু শুধোয়, 'জিলা আউর গাঁওকা নাম?'

তাবত বিবরণ লেখা হয়ে গেলে জগদেও যখন কনট্রাক্ট ফর্ম বার করে তার নাম লিখে টিপসই দিতে বলে তখন বেঁকে বসে ধনপত। অঙ্গুঠায় টিপছাপের ব্যাপারে ভীষণ ভয় তার। ধনপত শুনেছে, তার নানার নানাকে দিয়ে কী একটা করজপত্রে অঙ্গুঠার ছাপ লাগাবার ফলে তাদের সামান্য জমিটুকু চন্দ্রিকা সিংরা দখল করে নিয়েছে। তাতে তিন পুরুষ ধরে তাদের জনমদাসের জীবন কাটাতে হচ্ছে। মুক্তির জন্য ধুরুয়া গাঁ থেকে পালিয়ে এসে আবার কোন মারাত্মক দায়ে আবদ্ধ হতে চলেছে কিনা কে জানে। ভীরু গলায় সে বলে, 'একগো বাত মিশিরজি—'

'কা?'

'আমাদের টিপছাপ নিচ্ছেন কেন?'

'বড়ে কোম্পানিতে কাম করতে হলে কনটেরাক্ট করতে হয়। এ হল কোম্পানিকা কানুন—সমঝা?'

ভয়ে ভয়ে ধনপত এবার জিজ্ঞেস করে, 'খতরা (বিপদ) কুছ নহী হোগা তো?'

ভরসা দিয়ে মিশিরজি বলে, 'আরে নহী নহী, চিন্তাকা কোঈ বাত নহী। লাগাও টিপছাপ—'

সংশয় পুরোটা কাটে না ধনপতের। তবে পিপরিয়া পর্যন্ত এসে এখন আর পিছানো যায় না। মনে খিঁচ নিয়েই সে টিপসই দেয়।

ধনপতের পর চাঁদিয়া। তারপর একে একে বাকি সবাই। মোট ছিয়াত্তর জনের নামধাম মিশিরজির পাকা খাতায় উঠে যায়।

মিশিরজি বলেছিল, দশ 'মিনটে'র ভেতর সব কাজ চুকিয়ে ফেলবে। কিন্তু এতগুলো লোকের সমস্ত বিবরণ লিখে, টিপছাপ নিয়ে, খোরাকি বাবদ চাল গম আটা নিমক ইত্যাদি দিতে দিতে সন্ধে নেমে যায়।



জায়গাটার একদিকে চাপ-বাঁধা ঘোর জঙ্গল। আরেক দিকে আদিগন্ত ফাঁকা মাঠ বলে শীতটা এখানে মারাত্মক। সন্ধ্যা নামার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় আকাশ থেকে যেন বরফ পড়ছে। মাটির লক্ষকোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসছে অজস্র হিমের কণা। মনে হয়, শরীরের সব রক্ত বুঝি জমাট বেঁধে যাবে।

সারিবদ্ধ ঘরগুলোর শেষ মাথায় পাশাপাশি দুটো ঘর পেয়েছে চাঁদিয়া এবং ধনপত।

এর মধ্যেই যে যার জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে। দুই ঘরেই হেরিকেন জ্বলছে। শুধু তাদের ঘরেই না, পাশাপাশি সব ঘরেই আলো দেখা যাচ্ছে। রাতের খাদ্য তৈরির জন্য তোড়জোড় চলছে পুরোদমে। সকলেরই ইচ্ছা রাতের খাওয়া চুকিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কম্বলের ভেতর ঢুকে যাবে।

আর সবার মতোই আটা ছেনে বেলে নিয়েছে ধনপত। আলু এবং ভিণ্ডি কুটে ধুয়ে রেখেছে সিলভারের একটা বাটিতে। রুটি আর আলু-ভিণ্ডির ভাজি দিয়ে আজকের রাতটা চালিয়ে নেবে। কিন্তু রসুই করার কায়দাকানুন কিছুই জানে না ধনপত। তারা গরীবের চাইতেও গরীব। পেটের জন্য দিনরাত তাদের ঘাড় গুঁজে পশুর মতো খাটতে হয়। তাই বলে কোনদিন ভাত বা রুটি তাকে নিজের হাতে বানিয়ে নিতে হয়নি। বাড়িতে মা-ই এ সব করে।

জীবনে এই প্রথম রুটি বানাতে গিয়ে ভয়ানক বিপদে পড়ে যায় ধনপত। ভাণ্ডারা থেকে সবাইকে চুলহা এবং শুকনো লকড়ী দেওয়া

হয়েছে। নিজের চুলহাটা ধরিয়ে রুটি সেঁকতে গিয়ে প্রথম দু-তিনটে সে পুড়িয়ে ফেলে। রুটিগুলো কতক্ষণ আগুনের ওপর ধরে রাখতে হয় সে সম্পর্কে তার আন্দাজ নেই। ধনপত একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়ে। এই ঝঞ্ঝাটের চেয়ে একসঙ্গে চাল-ডাল-সব্জি-টব্জি বসিয়ে ফুটিয়ে নেওয়াটা সহজ ছিল। রুটি বানানো স্থগিত রেখে তা-ই করবে কিনা যখন ভাবছে সেই সময় পাশের ঘর থেকে চাঁদিয়া বলে ওঠে, 'কা, তোমার রোটি বানানো হয়ে গেল?'

ধনপত বলে, 'নহী।'

চাঁদিয়া টের পেয়েছে, অনেকক্ষণ ধরেই রান্নার ব্যবস্থা করছে ধনপত। এতক্ষণে সব হয়ে যাওয়ার কথা। সে একটু মজা করে বলে, 'অনেক কিছু রসুই করছ বুঝি?'

'অনেক আর কোথায়? সিরেফ রোটি আউর ভিণ্ডি-আলু ভাজিয়া।' ধনপত বলে।

শুনে বেশ অবাকই হয়ে যায় চাঁদিয়া, 'রোটি ভাজিয়া বানাতে এত্তে সময় লেগে যাচ্ছে!'

বিব্রতভাবে ধনপত বলে, 'বহোত মুসিবত হো গিয়া—'

'কা মুসিবত?'

হঠাৎ ধনপতের মনে হয়, রান্নার ব্যাপারে এই মেয়েটার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। কথাটা প্রথম থেকেই কেন যে খেয়াল হয়নি তার। নিজের অক্ষমতা আনাড়িপনা জানিয়ে ধনপত বলে, 'রোটি বানাতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছি।'

'দাঁড়াও আসছি।'

একটু পর চাঁদিয়া এসে বলে, 'কোঈ কামকা নহী। চুলহার কাছ থেকে সর।'

রান্নার আগেই বিছানা পেতে রেখেছিল ধনপত। গায়ে কম্বল জড়িয়ে সে সেখানে গিয়ে বসে। আর ক্ষিপ্র নিপুণ হাতে রুটি এবং ভাজি বানাতে বানাতে চাঁদিয়া কিছু ভাবে। তারপর বলে, 'একগো বাত।'

'কা?'

'রসুই করতে তো শেখো নি। পাশের ঘরে তুমি ভুখা থাকবে, এ তো আর হয় না। কাল থেকে চাল-ডাল-আটা আমাকে দিও। ভাত-রোটি বানিয়ে দেব।'

মনে মনে খুশিই হয় ধনপত। মুখে অবশ্য বলে, 'তোমার তখলিফ হবে।'

চাঁদিয়া জানায়, তার প্রাণ বাঁচানো থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যা যা ধনপত করেছে, সেই তুলনায় রান্না করে দেওয়াটা কিছুই না. তাছাড়া নিজের জন্যও ভাত ফোটাতে বা রুটি সেঁকতে তো হবেই। সেই সঙ্গে ধনপতেরটা রেঁধে দিলে এমন কিছুই তখলিফ হবে না।

কথায় কথায় রুটি এবং ভাজি তৈরি হয়ে যায়। চুলহা নিভিয়ে উঠে দাঁড়ায় চাঁদিয়া। বলে, 'এখন যাই।'

'ঠিক হ্যায়।'

চাঁদিয়া চলে যায়।

আরো কিছুক্ষণ পর টানা ব্যারাকের মতো সারি সারি ঘরগুলোতে আলো নিভে যায়। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে সবাই এখন কম্বলের তলায় ঢুকে গেছে।

মানুষের চেনাজানা পৃথিবী থেকে অনেক অনেক দূরে, ভূগোলের এই জনহীন প্রান্তে রাত গভীর হতে থাকে। কুয়াশা এবং অন্ধকার আরো ঘন হয়। বাতাসে আরো হিম মিশতে থাকে।



কাদের চিৎকারে যেন সকালে ঘুম ভেঙে যায় ধনপতের।

'হেই—হেই—উঠে পড়ে সব, উঠে পড়্। সকাল হয়ে গেছে।'

'হেই—হেই—'

একসঙ্গে পাঁচ সাতজন এক দিক থেকে আরেক দিকে হাঁটতে হাঁটতে হেঁকে যাচ্ছে।

কম্বলের তলা থেকে মুখ বাড়ায় ধনপাত। দরজা বন্ধ থাকলেও টের পাওয়া যায় বাইরে বেশ আলো আছে। প্রথমটা সে বুঝতে পারল না, কোথায় রয়েছে।

চিৎকারটা আবার কানে এল, 'কামকা টেইন' (টাইম) হো গিয়া। দের নায় করনা—'

এবার সব মনে পড়ে যায় ধনপতের। ধড়মড় করে উঠে দ্রুত দরজা খুলে বাইরে আসে। তার চোখে পড়ে, প্রায় সব ঘর থেকেই লোকজন বেরিয়ে পড়েছে। তাদের ভেতর চাঁদিয়াকেও দেখা যাচ্ছে।

একটু দূরে ঘমুয়া এবং আরো কয়েকজনকে দেখা গেল। এরা মিশিরজির লোক। ঘমুয়া বলে, 'তুরন্ত মুখটুখ ধুয়ে চায়-পানি খেয়ে অফিসের সামনে চলে এস। সাত বজ গিয়া। সাড়ে সাতটার ভেতর জরুর আসবে। হাজিরা খাতায় টিপছাপ দিয়ে আটটায় কাম চালু করতে হবে। জলদি জলদি চলা আও, মিশিরজি বুলায়া হ্যায়।' বলে ঘমুয়া তার দলবলসমেত অফিসের দিকে চলে যায়।

ঘমুয়ারাই তাহলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে তাদের ঘুম ভাঙিয়েছে। ধনপতের

চোখ জুড়ে এখনও ঘুম লেগে আছে। কাল ভোর থেকে তার ওপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে যেন। শরীরে আর কিছু নেই তার। হাত-পায়ের জোড়গুলো একেবারে আলগা হয়ে গেছে। পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত অসহ্য ব্যথা। আজকের দিনটা পুরো ঘুমিয়ে নিতে পারলে শরীরটা চাঙ্গা হয়ে যেত। কিন্তু তার আর উপায় নেই। মুনোয়ার-প্রসাদ এবং মিশিরজিরা ট্রেন আর ভৈসা গাড়িতে চড়িয়ে এখানে এনে উৎকৃষ্ট 'ভোজন' এবং থাকার যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা নিশ্চয়ই ঘুমোবার জন্য নয়। কাজে তাকে বেরুতেই হবে।

চাঁদিয়া তার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। ধনপতকে দেখে সে কাছে এগিয়ে আসে। বলে, 'মুহ্ ধুয়ে নাও। কালকের সব রোটি খেয়ে ফেলেছ?'

'নহী।' ধনপত জানায়, 'দো-চারগো আছে।'

'খেয়ে-টেয়ে মিশিরজির কাছে চল।'

অনিচ্ছুক শরীর টেনে টেনে ওধারের কুয়োগুলোর দিকে চলে যায় ধনপত।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ছিয়াত্তর জন লোক মিশিরজির অফিসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিশিরজি কালকের সেই চেয়ারটায় বসে আছে। টেবলের ওপর নতুন ঢাউস একটা হাজিরা খাতা। প্রতিদিনের তারিখ দিয়ে এতে হাজিরা বাবদে মজুরদের টিপসই নিয়ে রাখা হবে।

খাতাটা খুলতে খুলতে মিশিরজি ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়ে নেয়। একটু আগে ঘন্নুয়া যা বলেছিল সেগুলোই আরেক বার জানিয়ে বলে, 'সুবে আটটা থেকে বিকেল আটটা পর্যন্ত তোমাদের ডিপটি (ডিউটি)। তার মধ্যে আধা ঘন্টা কালোয়া (দুপুরের খাবার) খাওয়ার জন্যে ছুটি। সমঝা?'

সবাই ঘাড় হেলিয়ে দেয়—বুঝেছে।

মিশিরজি আবার শুরু করে, 'রোটি-ওটি যা বানাবার ডিপটির পর

বেশি করে বানিয়ে রাখবে—যাতে পরের দিন সুবে আর হুফারে চা
যায়। না হলে সারা দিনে টেইন (টাইম) পাবে না। সমঝা ?' 'সমব
তার কথার মাত্রা।

নিঃশব্দে এবারও সকলে মাথা ঝাঁকাল।—সমঝেছে।

মিশিরজি ফের বলে, 'মনে রেখো, সুবে ঠিক সাড়ে সাতটায় এখা
হাজিরা দেবে। আটটায় 'ডিপটি' চালু হবে। কোম্পানিকা 'ডিপটি
টেইনের এধার ওধার হওয়া চলবে না। সমঝা ?'

সকলে মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মিশিরজি বলে, 'এবার হাজিরা খাতায় টিপছাপ্পা মারো—'

ছিয়াত্তর জনের টিপসই নেবার পর মিশিরজি ডান দিকে ঘা
ফিরিয়ে ডাকে, 'রামধনিয়া, এ রামধনিয়া—'

রামধনিয়া নামে মধ্যবয়সী একটা লোক ডান দিক থেকে দৌ
আসে। তার চৌকো মুখে অগুণতি বসন্তের দাগ। মজবুত হট্টাকা
চেহারা, শক্ত চোয়াল, ছোট ছোট গোল চোখ দুটোতে গিধের দৃষ্টি
সারা গা এবং মাথা ভারি কম্বলে জড়ানো। পায়ে কাঁচা চামড়ার নাগরা

মিশিরজি বলে, 'তোমার লোকজনরা 'রিডি' ?'

ঘাড় কাত করে রামধনিয়া বলে, 'রিডি।'

'ভাণ্ডারা থেকে দা-করাত-কুড়াল নিয়েছে ?'

'নিয়েছে।'

'এবার এদের নিয়ে জঙ্গলে চলে যাও। আজ পয়লা রোজ। ও
কালোয়া বানায় নি—মালুম হচ্ছে। 'ডিপটি'র হালচাল জানে না।
বাজে ছুট্টি দিয়ে দিও। কালসে পুরা চার বাজে তক ডিপটি। সমঝা ?
বলে ধনপতদের দিকে তাকায় মিশিরজি, 'রামধনিয়ার সঙ্গে চলে যা
তোমরা।'

কিছুক্ষণের মধ্যে দেখা যায়, হাতে কুড়াল করাত ইত্যাদি ঝুলি
ছিয়াত্তর জন ভূমিহীন মজুর সামনের জঙ্গলটার দিকে কাতার দি
চলেছে। সবার আগে আগে যাচ্ছে রামধনিয়া এবং তার দলবল। এরাই
ধনপতদের তদারকি করবে।



ায় মাইল ছয়েক জায়গা জুড়ে সুবিশাল বনভূমি। পিপরিয়া সিমেন্ট ক্টরির মালিকরা পুরো জঙ্গলটা কিনে নিয়েছে। এখানে বসবে মেন্টের কারখানা। এরপর একে একে আরো বড় বড় ফ্যাক্টরি ানো হবে।

গোটা জঙ্গলটার যেদিকেই তাকানো যাক, পিপর কড়াইয়া অর্জুন ং আঁওলা গাছের ছড়াছড়ি। আর আছে ট্যারাবাঁকা চেহারার গুণতি সীসম গাছ। ফাঁকে ফাঁকে অনেকটা জায়গা জুড়ে চাপ-বাঁধা লের জঙ্গল বা কাশের ঝোপ। দু মাস আগেও সাদা কাশ ফুলে রদিক আলো হয়ে থাকত। অঘুন মাস পড়তে না পড়তেই অসহ্য হিমে লগুলো বিবর্ণ হয়ে ঝরে গেছে, এখন শীর্ণ ডাঁটাগুলো শুধু খাড়া হয়ে াছে। তবে কুলগাছগুলোতে সতেজ নতুন পাতা দেখা দিয়েছে, কচি চি অজস্র সবুজ ফুলে গাছগুলো বোঝাই।

কাশফুলগুলো যতই ম্লান হয়ে ঝরে যাক, গোটা জঙ্গল জুড়ে এখানে খানে কত যে মনরঙ্গোলি আর গোলগোলি ফুল ফুটে আছে। মাঝে ঝে দু-একটা বিল ঘন গাছপালার ভেতর প্রচুর টোপা পানা, শ্যাওলা ং আগাছায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। চারধার থেকে সেগুলোর ওপর কে পড়েছে নানা গাছের ডালপালা।

এই অঘুনে পরদেশী শুগারা ঝাঁকে ঝাঁকে এখানে এসে হানা তো য়েছেই। এ ছাড়া এসেছে হাজার হাজার শীতের মরসুমি পাখি—

সিল্লি কাঁক মানিকপাখি। বনভূমির মাথায় এই সব পাখি নানা রঙের ফোয়ারা হয়ে উড়ছে।

জঙ্গলের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ায় রামধনিয়া। অগত্যা সবাইকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

রামধনিয়া বলে, 'কিভাবে তোমাদের ডিপটি দিতে হবে, বুঝিয়ে দিচ্ছি।' সে যা জানায় তা এইরকম। সঙ্গে তার যে চারজন সহকারী আছে তারা ধনপতদের চার ভাগ করে জঙ্গল সাফাইয়ের কাজ চালু করবে। বড় বড় পেঁড় বা গাছগুলো কাটবে শক্তসমর্থ পুরুষেরা। ছোট ছোট গাছ আর ঝোপঝাড় সাফ করবে আওরতেরা। তা ছাড়া কাশের জঙ্গলগুলোও পুড়িয়ে দেবার দায়িত্ব আওরতদেরই। এই কারণে রামধনিয়ার লোকেরা কয়েক টিন পেট্রোল সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে।

রামধনিয়া ছিয়াত্তর জনকে চার দলে ভাগ করে তার চার সহকারীর হাতে একেকটা দল তুলে দেয়। দেখা যায়, ধনপত এবং চাঁদিয়া একই দলে পড়েছে।

পুরুষ এবং আওরত মিলে ধনপতদের দলে মোট উনিশ জন। পাঁচ জন আওরত, বাকি সব পুরুষ। যে হুকুমদারের কাছে তাদের 'ডিপটি দিতে হবে তার নাম বজরঙ্গীলাল।

বজরঙ্গীলালের বয়স পঞ্চাশ বাহান্ন। পোড়া তামাটে রং। লম্বা আখাম্বা চেহারা। পরনে ফুল প্যান্ট এবং জামার ওপর ভারি রোঁয়াওলা কম্বল। নাকচোখ ছাড়া মাথা কান এবং মুখের বাকি অংশ কম্ফোর্টারে ঢাকা।

রামধনিয়ার নির্দেশে চারটে দল জঙ্গলের চারদিকে যায়। বজরঙ্গীলাল তার দলটাকে নিয়ে যায় পুব দিকে।

এখানে এক রশি জায়গা জুড়ে কাশ এবং কুলের জঙ্গল। তার পাশেই সারিবদ্ধ সীমার পরাস এবং পিপর গাছ। গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে নানা ধরনের বুনো লতা।

রামধনিয়া সামনের বড় পিপর গাছটা দেখিয়ে পুরুষদের উদ্দেশে

বলে, 'তোমরা এই পেঁড়টা কাটতে শুরু কর। পয়লে ডালগুলো কেটে পরে গুঁড়ি কাটবে।'

ধনপতরা পিপর গাছের কাছে চলে যায়।

এবার রামধনিয়া আওরতদের কাশের জঙ্গল পোড়াবার প্রক্রিয়া শিখিয়ে দেয়। প্রথমে কাশঝোপের ওপর পেট্রোল বা কেরোসিন ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেই শুকনো ডাঁটিগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। অবশ্য কুলগাছগুলো এই পদ্ধতিতে নির্মূল করা সম্ভব না, সেগুলো কেটে ফেলতে হবে।

সব কিছু বুঝিয়ে দেবার পর পেট্রোলের একটা টিন ধরিয়ে চাঁদিয়াদের হাতে দেয় বজরঙ্গীলাল। বলে, 'পিটরোল বহোত খতরনাক চীজ। শলাই (দেশলাই) জ্বালিয়ে দিলে আগ (আগুন) লাফিয়ে লাফিয়ে চারদিকে ছুটতে থাকে। হোঁশিয়ার—'

চাঁদিয়া ছাড়া অন্য আওরতরা জানায়, পেট্রোল যে কতখানি বিপজ্জনক বস্তু তা তারা জানে। কাজের সময় নিশ্চয়ই খুব সতর্ক থাকবে।

এবার বজরঙ্গীলাল চাঁদিয়ার দিকে তাকায়, 'কি, তুমি তো কিছু বললে না। পিটরোল ক্যায়সা চীজ—জানো?'

আজ ডিউটিতে আসার সময় চাঁদিয়া লক্ষ করেছে, বার বারই এই আখাম্বা চেহারার বজরঙ্গীলাল তার দিকে তাকাচ্ছিল। তাকানোতে দোষ নেই। চাঁদিয়া সাদাসিধা 'গাঁওকা লেড়কি'। আগে হলে বজরঙ্গীলালের এই তাকানোর পেছনে খারাপ কিছু খুঁজে পেত না। কিন্তু এই কয়েক দিনে তার মধ্যে অনেক ভাঙচুর হয়ে গেছে। দুবেজি এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা তার শরীরটা ছিঁড়েখুঁড়ে যা করেছে তাতে সেই গ্রাম্য সরলতার চিহ্নমাত্র নেই। ধনপতকে বাদ দিলে অন্য সব মানুষের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়েছে। চাঁদিয়ার মনের কোন অদৃশ্য জায়গায় কেউ যেন জানান দিয়ে যাচ্ছে—এই লোকটা ভাল না।

বজরঙ্গী পেট্রোলের ভয়াবহতা সম্পর্কে আরেক বার প্রশ্ন করে।

চাঁদিয়া মাটিতে চোখ রেখে অন্য মেয়েমানুষগুলোকে দেখিয়ে বলে,

'আমি ঠিক জানি না। তবে এদের কাছ থেকে জেনে নেব।'

'ঠিক হ্যায়। আমিও ডিপটির সময় কাছে কাছে থাকব, জরুরত হলে পুছনাছ করে নিও। যাও, আভি কাম চালু কর দো।'

চাঁদিয়ারা কাশের জঙ্গলের দিকে চলে যায়।

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, উচু পিপর গাছে ধনপতরা বারো জন উঠে মোটা মোটা ডাল কাটতে শুরু করেছে। নিস্তব্ধ বনভূমি জুড়ে শব্দ উঠছে—খট খট খট খট—

জ্ঞান হবার পর থেকে ধনপত চন্দ্রিকা সিংয়ের ক্ষেতি এবং খামারে কাজ করে আসছে। চাষ ছাড়া অন্য কাজের অভ্যাস বা অভিজ্ঞতা কিছুই নেই তার। গাছ কাটতে তার খুবই অসুবিধা হচ্ছিল।

ধনপত যে ডালটা কাটছিল তার পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে আরেকটা ঝাঁকড়া মোটা ডাল বেরিয়ে গেছে। একটা কমজোরি রোগাটে বুড়ো সেটা কাটছে। দুর্বল হলেও গাছকাটার কায়দা বা নিয়ম সে জানে।

গাছে কোপ বসাতে বসাতে বুড়োটা কাশছিল। কাশতে কাশতে সে বলে, 'দুনিয়ায় আর পেঁড়উড় থাকবে না।'

কথাগুলো কানে এসেছিল ধনপতের। সে শুধোয়, 'মতলব?'

বুড়ো লোকটা বলে, 'দুনিয়া জুড়ে জঙ্গল সাফ করে কারখানা আউর টৌন বসছে। পেঁড়উড় বাঁচে কী করে?'

ধনপতের দুনিয়ার পরিধি হল ধুরুয়া এবং তার চারপাশের বিশ পঁচিশটা দেহাতী গাঁ। এর বাইরে পরশু ভোরেই সে প্রথম পা বাড়িয়েছে। তাও পিপরিয়ার নির্জন স্তব্ধ বনভূমি পর্যন্তই তার দৌড়। এতকাল যেখানে যেখানে গেছে, কোথাও গাছপালা কাটতে দেখেনি। অথচ এই বুড়োটা একেবারে অন্য কথা বলছে। একটু অবাক হয়েই সে বলে, 'তোমার কথা বুঝলাম না।'

গাছকাটা আপাতত স্থগিত রেখে বুড়োটা এবার যা বলে, সংক্ষেপে এইরকম। তার নাম রামবনবাস। বিহারের এমন এক জায়গায় তার ঘর

যেখানে মাইলের পর মাইল কাঁকর মেশানো পড়তি জমি। সেখানকার মাটি ফাটিয়ে পাঁশুটে রঙের আগাছা ছাড়া আর বিশেষ কিছুই জন্মায় না। তাই কাজ এবং খাদ্যের খোঁজে আজীবন তাকে গোটা বিহার এফোঁড় ওফোঁড় করে বেড়াতে হচ্ছে।

যেহেতু এমন এক জায়গায় রামবনবাসের গাঁ যেখানে সবুজের চিহ্ন-মাত্র নেই, তাই গাছপালা দেখলে সে খুশি হয়। তার মধ্যে বৃক্ষপ্রেমিক একটি মন আছে। কিন্তু এমনই বরাত, এই বুড়ো বয়স পর্যন্ত যত কাজ সে পেয়েছে তার বেশির ভাগই বন কাটাইয়ের কাজ। বিহারের এ মাথা থেকে ও মাথায় ছুটতে ছুটতে তার নিজের হাতে কত স্নিগ্ধ শান্ত বনভূমি যে ধ্বংস হয়েছে, নির্মূল হয়েছে কত যে মহিমান্বিত বনস্পতি তার হিসেব নেই।

গাছ কাটতে কাটতে দুঃখে রামবনবাসের মন ভরে গেছে। বৃক্ষলতা তার কাছে 'ভগোয়ানের সন্তানে'র মতো। অথচ এ ছাড়া তার সামনে আর কোন পথ খোলা নেই। গাছ মরলে সে বাঁচবে, তার পেটের দানা জুটবে।

রামবনবাস জানায়, তার বয়স এখন ষাট পঁয়ষট। এর মধ্যে কত জঙ্গল নির্মূল হয়ে যেতে দেখল সে। অরণ্যের কাছ থেকে মাটি ছিনিয়ে নিয়ে বসছে কলকারখানা, বসছে ভারি ভারি শহর। এভাবে চললে পৃথিবী একদিন বৃক্ষলতাশূন্য মরুভূমি হয়ে যাবে।

রামবনবাস যখন একটানা নিজের কথা বলে চলেছে সেই সময় খানিকটা দূরে 'রশি'খানেক জায়গা জুড়ে আগুনের লকলকে ফণা আকাশের দিকে উঠতে থাকে। ওখানে কাশবনে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে চাঁদিয়ারা। তার আঁচে পট পট করে কাশের শুকনো ডাঁটিগুলো একটানা ফেটে যাচ্ছে।

হঠাৎ কথা বন্ধ করে উদাস চোখে কাশবনের আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকে রামবনবাস। তার দেখাদেখি ধনপতও সেদিকে তাকায়। তার হাতও অজান্তে থেমে যায়।

কতক্ষণ পর খেয়াল নেই, আচমকা পিপর গাছের তলা থেকে

বজরঙ্গীর চিৎকার ভেসে আসে, 'এই ভুচ্চরের ছৌয়ারা, কাম বন্ধ করে আগ দেখছিস। মজুরির পাইসা কেটে নিলে মালুম পাবি—' লোকটার শকুনের নজর। তাকে ফাঁকি দিয়ে চুপচাপ বসে বনভূমির জন্য শোক করার উপায় নেই কারো।

ধনপতেরা চমকে ওঠে। তারপরই হাতের কুড়াল চলতে থাকে। খট-খট-খট-খট—

বজরঙ্গী শাসানোর ভঙ্গিতে ফের বলে, 'হোঁশিয়ার। কামে ফাঁকি দিবি না। আমি বহোত খতরনাক আদমী। ফাঁকি দিলে জান চৌপট করে দেব।' বলে আর দাঁড়ায় না, লম্বা লম্বা পা ফেলে ওধারে জ্বলন্ত কাশবনের দিকে চলে যায়।

কাশঝোপগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদিয়া এবং আরো চার আওরত। আগুনের অগুণতি লকলকে শিখ সামনে যা পাচ্ছে পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে স্নিগ্ধ নীলাকাশ।

বজরঙ্গী চাঁদিয়ার পাশে এসে দাঁড়ায়। বলে, 'পিটরোল দিয়ে কী করে আগ ধরাতে হয়, শিখে নিয়েছ?'

চমকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় চাঁদিয়া। বজরঙ্গীকে এত কাছে ঘন হয়ে দাঁড়াতে দেখে ভেতরে ভেতরে ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা গলায় বলে, 'হাঁ।'

'বহোত আচ্ছা।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে কি ভেবে বজরঙ্গী নীচু গলায় বলে, 'তুমি তো একলাই এখানে এসেছ?'

'হাঁ।' চাঁদিয়া মাথা নাড়ে।

'বরখা নদীর ওপারে দধিপুরায় তো তোমাদের গাঁ—'

চাঁদিয়া অবাক হয়ে বলে, 'হাঁ। আপনি কি করে জানলেন?'

বজরঙ্গী একটা চোখ কুঁচকে রহস্যময় হেসে আস্তে আস্তে মাথা নাড়তে নাড়তে বলে, 'জানতে পারলাম। এই খবরটার জন্যে চোখকান খোলা রাখতে হয়েছে।' বলতে বলতে খৈনির ছোপ-ধরা ট্যারাবাঁকা দাঁত বার করে নিঃশব্দে হাসতে থাকে।

একটু ভাবতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। মিশিরজি যখন বড় খাতায় তাদের নামধাম লিখছিল সেইসময় বজরঙ্গী নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোথাও ছিল। তখনই তার নাম শুনে থাকবে।

বজরঙ্গী আবার বলে, 'গাঁওমে কৌন হ্যায় তুমনিকা?'

লোকটার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে না চাঁদিয়ার। মা-বাবা ভাই-বোনের প্রসঙ্গ উঠলে বজরঙ্গী অনেক কিছু জানতে চাইবে। সে বলল, 'কোঈ নহী।'

'ছুনিয়ায় তুমনি একেলী—হাঁ।' রীতিমত অবাকই যেন হয়ে যায় বজরঙ্গী। তারপর জিভের তলায় সহানুভূতিসূচক চুক চুক আওয়াজ করে বলে, 'বহোত দুখকা বাত।'

চাঁদিয়া উত্তর দেয় না।

বজরঙ্গীর হঠাৎ খেয়াল হয়, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চাঁদিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। একা চাঁদিয়াকে পেলেই ভাল হত। কিন্তু অন্য চারটে আওরত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। কাজের সময়টা এভাবে নষ্ট করা ঠিক না। সে বলে, 'এখন ডিপটিকা টেইন। পরে তোমার কথা ভাল করে শুনব।' অন্য আওরতদের দিকে ফিরে বলে, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগ দেখলে চলবে না। কাশের জঙ্গল জ্বলুক। তোমরা আমার সঙ্গে চলো।'

আওরতদের নিয়ে খানিকটা দূরে কুলগাছের জঙ্গলের কাছে চলে আসে। বলে, 'এগুলো সাফ করতে থাকো।'



ওয়েস্ট এণ্ড ওয়াচ কোম্পানির পুরনো গোল একটা ঘড়ি বজরঙ্গীর বাঁ কব্জিতে স্টিলের চওড়া ব্যাণ্ডে বাঁধা রয়েছে। সেটার দিকে চোখ রেখে কাঁটায় কাঁটায় ছুটোয় চেঁচিয়ে ওঠে, 'আজকের মতো 'ডিপটি' খতম।' তার চিৎকার কুল জঙ্গলের ওপর দিয়ে দূরে পিপর গাছগুলোর দিকে ছুটে যায়।

আরো দূরে ঘন বনঝাউ দেওদার এবং সীমার গাছের জটলার পাশ থেকে অন্য হুকুমদারদেরও গলা ভেসে আসে, 'ডিপটি খতম।'

কিছুক্ষণ পর দেখা যায়, ক্লান্ত মজুরেরা 'বারিকে' (ব্যারাকে) ফিরে চলেছে। সবার সঙ্গে চাঁদিয়া এবং ধনপতও হাঁটছিল।

জঙ্গল কাটাইয়ের প্রথম দিনটা কেমন কাটল, এই নিয়ে টুকরো টুকরো কথা বলছে সকলে।

চাঁদিয়া ধনপতকে বলে, 'কাশের জঙ্গল আজ অনেকটা সাফ করে ফেলেছি। দো দোগো কুলগাছও কেটেছি। তুমি কী করলে ?'

ধনপত বলে, 'কাশের ঝোপ সাফ করা কী এমন কাজ। আগ ধরিয়ে দিলেই হল। আর কুল তো ছোট ছোট গাছ, দিনে বিশটা কেটে ফেলা যায়। লেকেন—' সে জানায়, পিপর গাছ কাটা বহোত ভারী কাম। একটা গাছ নিশ্চিহ্ন করতে দশ বারোটা আদমির কমসে কম পনের রোজ লেগে যাবে।

কথাটা মেনে নেয় চাঁদিয়া। মাথা নেড়ে বলে, 'হাঁ—'

'গাছ কাটার কাজ আগে করিনি। ভারি কষ্ট হচ্ছে। তবে—'

'কা?'

'জ্যাদা পাইসা পেলে এই কষ্টটা আর কষ্ট মনে হবে না।'

'হাঁ।'

একটু চুপচাপ। তারপর ঝপ করে গলার স্বরটা অনেক নিচে নামিয়ে ধনপত বলে, 'পিপর গাছের ডাল কাটতে কাটতে একগো চীজ নজরে পড়ল।'

'কা?' চাঁদিয়া উৎসুক চোখে ধনপতের দিকে তাকায়।

'হুকুমদার বজরঙ্গীজি তোমার সঙ্গে বহোত কথা বলছিল। যখন কুলগাছ কাটছিলে তোমার কাছে দাঁড়িয়ে হাসছিল। বহোত মজাদার গপসপ হচ্ছিল—না?'

প্রথমটা অবাক হয়ে যায় চাঁদিয়া। অতদূর থেকে ধনপত যে তার ওপর নজর রেখেছে—বিস্ময়টা সেই কারণে।

ধনপত এবার শুধোয়, 'কী এত গপ করছিল হুকুমদার?'

'আমার খবর নিচ্ছিল। গাঁও কঁহা, ঘরমে কোঈ হ্যায়—এইসব। লেকেন—'

'কা?'

বিমর্ষ গলায় চাঁদিয়া বলে, 'ও আদমি আচ্ছা নহী—'

একটু হকচকিয়ে যায় ধনপত, 'কায়? গাঁও-ঘরের খবর নিলে আদমি বুরা হবে কেন?'

চাঁদিয়া জানায়, বজরঙ্গীর তাকানো এবং কথা বলার ভঙ্গি ভাল না। বজরঙ্গী বলেছে পরে তার সঙ্গে জমিয়ে আলাপ করবে। এসব চাঁদিয়ার খুবই অপছন্দ।

ধনপত মজা করে বলে, 'হুকুমদারের নজরে পড়ে গেছ। এ তো বহোত সৌভাগ।'

চাঁদিয়া বলে, 'এমন সৌভাগের মুখে তিনবার থুক।'

চাঁদিয়াকে রেগে উঠতে দেখে ধনপত আর ঠাট্টা টাট্টা করে না।

চাঁদিয়া আবার বলে, 'আমার মনে হচ্ছে, আদমিটা আমার ঘরেও আসবে। তুমি একটু নজর রেখো।'

ধনপত বুঝতে পারে, এই দুঃখী মেয়েটা তার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে শুরু করেছে। সে বলে, 'ঠিক হ্যায়—রাখব।'

কথায় কথায় তারা সেই সারিবদ্ধ ঘরগুলোর কাছে পৌঁছে যায়।



ছিয়াত্তর জন জঙ্গলকাটোয়া যে যার নিজের ঘরে গিয়ে প্রথমে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নেয়। তারপর ওধারের কুয়োগুলো থেকে 'নাহানা' চুকিয়ে এসে চুলহা ধরিয়ে রান্না চড়িয়ে দেয়।

এদিকে অঘুন মাসের বেলা আরো হেলে গেছে। অনেক দূরে পছিমা আকাশ যেখানে দিগন্তে ঝুঁকে পড়েছে, সূর্যটা সেখানে নেমে গেছে। আর কিছুক্ষণ পর ওটাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

রোদের রং এখন বাসি হলুদের মতো। পৃথিবীর তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে। হিমালয় এখান থেকে বেশি দূরে নয়। উত্তুরে বাতাস সারা গায়ে বরফ মেখে সামনের বনভূমির ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে যেন।

অন্য সবার মতো চাঁদিয়াও চুলহা ধরিয়েছে। তার আগে ধনপতের কাছ থেকে চাল ডাল আলু পেঁয়াজ নিয়ে এসেছিল। আজ তারা ভাত খাবে। শুধু আজ রাতের মতোই না, কাল দুপুর পর্যন্ত যাতে চলে সেই রকম হিসেব করে দু'জনের চাল ডাল মেপে নিয়েছে চাঁদিয়া।

রান্নার ঝামেলা না থাকায় পুরোপুরি ঝাড়া হাত-পা হয়ে গেছে ধনপত। 'নাহানা' চুকিয়ে পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, তার ওপর নতুন রোঁয়াওলা কম্বল চাপিয়ে চাঁদিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় সে। বলে, 'রসুই হতে কতক্ষণ লাগবে?'

'এই তো চুলহা ধরালাম। ভাত হবে, ডাল হবে, ভাজি হবে। অনেক সময় লাগবে।' চাঁদিয়া মুখ তুলে জানায়।

ধনপত বলে, 'তা হলে আমি আফিস থেকে ঘুরে আসি।'

'আফিসে কী?'

অফিসে যাওয়ার পেছনে একটা উদ্দেশ্য আছে ধনপতের। ছুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় মুনোয়ারপ্রসাদ জানিয়েছিল, দৈনিক মাথাপিছু দশটাকা বিশ পয়সা করে মিলবে। মজুরিটা কিভাবে পাওয়া যাবে, সেটা জানা হয়নি। অফিসে গিয়ে মিশিরজির কাছে সেটা জানতে চেষ্টা করবে। এই কথাগুলোই ধনপত চাঁদিয়াকে বলল।

চাঁদিয়া বলে, 'ঠিক হ্যায়। বেশি দেরি করো না। সুরয ডুবে অন্ধেরা নামতে নামতেই আমার রসুই হয়ে যাবে।'

এধারে ঘরের পর ঘর। তারপর কাচ্চী বা কাঁচা রাস্তা। রাস্তার ওধারে কুয়োর সারি। কাচ্চী ধরে অফিসের দিকে এগিয়ে যায় ধনপত। কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই কে যেন ডেকে ওঠে, 'এ ভেইয়া—ভেইয়া হো।'

ধনপত থমকে দাঁড়ায়। ডাকটা যে তারই উদ্দেশে সেটা বুঝতে পেরে এধারে ওধারে তাকায়।

'ইহা—ইহা—'

এবার চোখে পড়ে যায়। ডানপাশের একটা ঘর থেকে একটা আধবুড়ো লোক তাকে হাত নেড়ে ডাকছে। অগত্যা অফিসে যাওয়া আপাতত স্থগিত রেখে লোকটার দিকেই পা বাড়ায় ধনপত।

লোকটা তার ঘরের সামনে ছেঁড়া চট বিছিয়ে বসে আয়েশ করে হাতের চেটোতে খৈনি ডলছিল। এর মধ্যে তার 'নাহানা' হয়ে গেছে। ক্ষারে কাচা পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, কাকই দিয়ে পরিপাটি চুল আঁচড়ে নিয়েছে। লোকটাকে বেশ শৌখিন মনে হয়। একটু দূরে চুলহা ধরিয়ে একটা আওরত রুটি সেঁকছে। ঘরের ভেতর দুটো বাচ্চা বেজায় হুড়োহুড়ি করছে। বোঝা যায় এরা আধবুড়ো লোকটার বউ বাচ্চা।

লোকটা চটের একটা কোণা দেখিয়ে বেশ খাতিরদারি করে বলে, 'বসো ভেইয়া, বসো।' তারপর কি মনে হতে শুধোয়, 'কোথাও যাচ্ছিলে নাকি? আটকে দিলাম?'

অফিসে যাওয়ার কথাটা আর জানায় না ধনপত। বলে, 'নহী। এমনিই ঘুরছিলাম।'

খানিকটা খৈনি ধনপতকে দিয়ে লোকটা বলে, 'দুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় তোমাকে দেখেছি। টিরেন আর ভৈসা গাড়িতে একসাথ পিপরিয়ায় এলাম। একসাথ অনেক দিন থাকব। ভাবলাম, তোমার সঙ্গে আলাপটা করে নিই।'

লোকটাকে হয়তো আগে দেখেছে ধনপত। তবে ভাল করে লক্ষ করেনি। তার কথায় সায় দিয়ে ধনপত বলে, 'হাঁ হাঁ, একসাথ থাকব। কার কখন কী দরকার হয়—'

লোকটা বেশ মিশুকে। কথায় কথায় ধনপতের নামধাম থেকে যাবতীয় খবর জেনে নেয় সে। তারপর রীতিমত অবাক হয়েই বলে, 'এখনও শাদি কর নি! তা হলে একটা আওরতের সঙ্গে তোমাকে সেই দুধলিগঞ্জের হাটিয়া থেকে দেখছি। ও তোমার জেনানা নয়?'

ধনপত বুঝতে পারে, চাঁদিয়ার কথা বলছে লোকটা। আগে মিশিরজিকে যা বলেছিল, এখানেও সেই উত্তরটাই দেয়। অর্থাৎ চাঁদিয়ার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই, রাস্তায় পরিচয় হয়েছে, ইত্যাদি।

আরো কিছুক্ষণ চাঁদিয়া সম্বন্ধে প্রশ্ন ট্রশ্ন করে নিজের কথা বলে লোকটা। তার নাম ভানচাঁদ। তার বাড়ি রাঁচির কাছে। এবছর সেখানে প্রচণ্ড খরায় মাঠঘাট টুটিফাটা হয়ে গেছে। বারিস (বর্ষা) না হওয়ার দরুন এক দানা ফসল হয়নি। এদিকে ভানচাঁদ গরীব ভূমিহীন কিষান। এক ধুর জমিও নেই তার। পরের ক্ষেতে কাজ করে সে এবং তার জেনানা পেটের দানা যোগাড় করে।

তা এবার এক বুঁদ বৃষ্টিও পড়েনি আকাশ থেকে। বৃষ্টি না হলে চাষ হয় কি করে? আর চাষই যদি মার খায়, ভানচাঁদরা কাজ পাবে কোথায়? সুতরাং কাজের খোঁজে তারা গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে এসেছিল দুধলিগঞ্জে, সেখান থেকে এই পিপরিয়ায়। রামজি বিষুণজির কিরপা, পেটের চিন্তা এখন কিছুদিন করতে হবে না।

ভানচাঁদ নিজের একটা গুণের কথাও বলে। সে ভাল নৌটঙ্কী

গান জানে। তার ইচ্ছা, দু-চার দিনের মধ্যেই সে এখানে সন্ধেবেলায় নৌটঙ্কীর আসর বসাবে। সারাদিন কাজের পর একটু আমোদ ফুর্তি তো দরকার।

গভীর আগ্রহে ভানচাঁদ শুধোয়, 'তোমার গান টান আসে?'

'নহী নহী—' ধনপত বলে, 'আমি গাইতে পারি না।'

'চিন্তা নায় করনা।' ভানচাঁদ ভরসা দেয়, 'তালিম দিয়ে দশ বিশ রোজের ভেতর তোমাকে ভাল গাইয়ে বানিয়ে নেব। গাধার গলায় আমি কোয়েলের সুর ফোটাতে পারি।'

ভানচাঁদ চমৎকার গল্প করতে পারে। কথায় কথায় কখন যে সূর্য ডুবে যায়, কখন যে সন্ধ্যা নেমে আসে, খেয়াল ছিল না। অন্ধকার নামতেই ধনপত ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়। বলে, 'আজ চলি ভানচাঁদ ভেইয়া।'

'ঠিক হ্যায়। নৌটঙ্কীর কথাটা মনে রেখো।' ভানচাঁদ বলে।

ফের কাচ্চীতে নামতেই ধনপত দেখতে পায়, অফিসের দিক থেকে দলবল নিয়ে মিশিরজি আসছে। সেই দলে বজরঙ্গীও রয়েছে। ধনপত দাঁড়িয়ে পড়ল।

কাছাকাছি আসতেই চোখে পড়ল, মিশিরজি ছাড়া বাকি সবার হাতেই শুকনো লকড়ি, ইট বা কেরোসিনের টিন।

মিশিরজিকে দেখে মজুরদের ঘর থেকে অনেকে বেরিয়ে আসে। সন্ধেবেলা কাঠ-টাঠ নিয়ে লোকগুলো কেন এদিকে এসেছে, বুঝতে না পেরে তারা বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে।

মিশিরজিই ব্যাপারটা পরিষ্কার করে দেয়। বলে, 'এখানে বহোত জাড় (শীত)। তাই তোদের জন্যে ক'টা 'ঘুর' (আগুনের কুণ্ড) বানিয়ে দেব। তাতে আরাম পাবি। তা ছাড়া—'

কে যেন শুধোয়, 'তা ছাড়া কী?'

'ডরনেকা কোঈ বাত নহী। জঙ্গল থেকে লাকরা কি ভাল্লুটাল্লু এদিকে আসতে পারে, ঘুরের আগুন দেখলে ভেগে যাবে।'

যদিও অভয় দিয়েছে মিশিরজি তবু মজুরদের চোখেমুখে লাকরা

এবং ভাল্লুকের কথায় ভয়ের ছায়া পড়ে। সন্ত্রস্ত গলায় তারা বলে, 'লাকরা উকরা এদিকে এলে তো জানে মেরে দেবে মিশরজি। কা হোগা হামনিলোগনকা ?'

মিশিরজি দু'হাত নেড়ে বোঝাতে থাকে, 'বললাম তো, ভয়ের কিছু নেই। আগকে সব খতরনাক জানবর ডরায়। তা ছাড়া আমার কাছে বন্দুক আছে। জানবর এদিকে এলে জান নিয়ে ফিরবে না। সমঝা ?'

মুখ দেখে মনে হয় না মজুররা বিশেষ সমঝেছে। ভিড়ের ভেতর থেকে ভানচাঁদের গলা শোনা যায়, 'এখানে না হয় 'ঘুর' জ্বালিয়ে দিলেন, জানবর এলে গোলি ছুঁড়বেন। লেকেন জঙ্গলে তো আমাদের যেতে হবে। জানবরের হাত থেকে সেখানে কে আমাদের বাঁচাবে ?'

'কাল থেকে বন্দুক নিয়ে পেহারাদাররা জঙ্গলে যাবে। চিন্তা নায় করনা—' বলেই সাঙ্গোপাঙ্গদের দিকে ফিরে মিশিরজি হুকুম দেয়, 'ঘুর বানিয়ে ফেল। কমসে কম আট দশগো।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই হুকুম তামিল করা হয়। ইট এবং মোটা মোটা কাঠের টুকরো সাজিয়ে কেরোসিন ছিটিয়ে মোট দশটা অগ্নিকুণ্ড বানিয়ে ফেলা হয়।

মিশিরজি তার লোকজনকে এবার বলে, 'রাতে উঠে দেখবি। 'ঘুর' নিভে এলে ফের নয়া লকড়ি দিবি। সমঝা ?'

'হাঁ—' সবাই সমস্বরে সায় দেয়।

'অব হমনি চলতা হ্যায়—' মিশিরজি আর দাঁড়ায় না। যেদিক থেকে এসেছিল, অর্থাৎ অফিসের দিকে ফিরে যেতে থাকে। তার সাঙ্গো-পাঙ্গরাও ঝাঁক বেঁধে পিছু নেয়।

নিজের অজান্তেই মিশিরজির সঙ্গে হাঁটতে শুরু করেছিল ধনপত। অফিসের কাছাকাছি এসে সে মিশিরজির নজরে পড়ে যায়। থমকে দাঁড়িয়ে মিশিরজি শুধোয়, 'কা রে, কিছু বলবি ?'

যে উদ্দেশ্যে আসা সেটা বলতে গিয়ে হঠাৎ ঘাবড়ে যায় ধনপত। বলে, 'হাঁ, তব্—'

'তব্ কা ?'

'পিছা বাতায়গা।'

'পিছা কেন, এখনই বল।'

'নহী মিশরজি—'

মিশিরজি জোরাজুরি না করে সোজা এগিয়ে গেল। অগত্যা ধনপতকে ফিরতে হয়।

নিজের ঘরের কাছে আসতেই বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে ধনপতের। সে ভেবেছিল, প্রথমে চাঁদিয়ার ঘরে যাবে। তার কাছ থেকে ভাত-ডাল-ভাজি নিয়ে নিজের ঘরে ঢুকবে। কিন্তু কাচ্চা থেকেই চোখে পড়ে চাঁদিয়ার ঘরে জমিয়ে বসে গল্প করছে বজরঙ্গী। লোকটা কখন যে দলছুট হয়ে এখানে চলে এসেছে, ধনপত লক্ষ করেনি। প্রথমটা সে কী করবে ভেবে পেল না। চাঁদিয়া আগেই আন্দাজ করেছিল, বজরঙ্গী তার ঘরে হানা দেবেই। কিন্তু তা যে আজ থেকেই, সেটা ভাবা যায় নি। চাঁদিয়া বলেছিল, লোকটার হালচাল, তাকানোর ভঙ্গি -সবই বহোত খারাপ। ধনপত যেন তার দিকে একটু নজর রাখে। সোজা কথায় বজরঙ্গীর হাত থেকে তাকে রক্ষা করার কথাই বলেছে চাঁদিয়া। কিন্তু ধনপতের মতো তুচ্ছ এক জঙ্গলকাটোয়ার পক্ষে প্রবল পরাক্রান্ত হুকুমদারের বুরা নজর থেকে চাঁদিয়াকে বাঁচানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

এমনিতে বরথা নদীর পারে চাঁদিয়াকে সে বাঁচিয়েছে, তারপর ভুধলিগঞ্জ হয়ে এই পিপরিয়া পর্যন্ত এসেছে—এতেই ধনপতের কর্তব্য শেষ হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

ধুরুয়া গাঁ থেকে সে পালিয়ে এসেছে গভীর এক উদ্দেশ্য নিয়ে। জনমদাসের দায়াবদ্ধ জীবন থেকে মা-বাপ-ভাই-বোনদের মুক্ত করে তাকে আনতেই হবে। চাঁদিয়াকে আগলে আগলে রাখা তার কাজ নয়।

কিন্তু বজরঙ্গীকে চাঁদিয়ার ঘরে জাঁকিয়ে বসে থাকতে দেখে বুকের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে ধনপতের। চব্বিশ পঁচিশ বছরের হট্টাকট্টা জোয়ান সে কিন্তু আগে আর কোন যুবতী মেয়ের এত কাছাকাছি আসেনি। দু-একবার বাপ-মা তার শাদির কথা তুলেছে।

কিন্তু সে শুধু কথাই। পরের ক্ষেতিতে বেগার দিয়ে পশুর জীবন যাদের যাপন করতে হয় তাদের কাছে শাদি ব্যাপারটা ঝুটা স্বপ্নই থেকে যায়।

আচমকা যেন মরিয়া হয়েই ধনপত চাঁদিয়ার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ায়। ভেতরে একধারে লণ্ঠন জ্বলছে। সেটার কাছে ভয়ে জড়সড় হয়ে বসে আছে চাঁদিয়া। আর বজরঙ্গী তার বিছানাটা দখল করেছে।

হাসি হাসি মুখে কী একটা মজার কথা বলতে যাচ্ছিল বজরঙ্গী, ধনপতকে দেখে তার চোখ বিরক্তিতে কুঁচকে যায়। বলে, 'কা রে, এখানে কিসের ধান্দায় ?'

চট করে কিছু ভেবে নিয়ে ধনপত বলে, 'আমার ভাত-ডাল নিতে এসেছি।'

'ভাত-ডাল। মতলব ?'

ধনপত জানায়, সে রান্নাবান্না করতে পারে না। তাই চাঁদিয়া তার রসুইয়ের দায়িত্বটা নিয়েছে।

নাকের ভেতর থেকে বিদ্রূপসূচক একটা আওয়াজ বার করে বজরঙ্গী বলে, 'শালে রাজা-মহারাজকে ছোয়া এসেছে! ওর রসুই আর একজন করে দেবে! নৌকরনী পেয়েছিস চাঁদিয়াকে ? কাল থেকে নিজের রসুই নিজে করে নিবি। না হলে লাথ মারকে হাড্ডি ঢিলা করে দেব। শালে ভূচ্চর—'

ধনপতকে দেখে অনেকখানি ভরসা পেয়েছে চাঁদিয়া। সে দ্রুত বলে ওঠে, 'আমি রসুই না করে দিলে আদমিগো ভুখা থাকবে।'

চাঁদিয়ার কথায় এবার যেন করুণাই হয় বজরঙ্গীর। বলে, 'চাঁদিয়া যব বোলা তব তো ঠিক হ্যায়।' পরক্ষণে নাক কুঁচকে ব্যঙ্গের সুরে বলে, 'শালে মনিস্টার আ গিয়া !—দাও চাঁদিয়া, ওর ভাত-ডাল দিয়ে দাও।'

চাঁদিয়া সিলভারের থালা বাটিতে ভাত-ডাল সাজিয়ে ধনপতকে দেয়। কাজেই এখানে দাঁড়িয়ে থাকার আপাতত কোন অজুহাত নেই।

খিদেয় পেটের ভেতরটা জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু নিজের ঘরে

এসে খাওয়ার কথাটা খেয়াল থাকে না ধনপতের। মস্তিষ্ক থেকে নতুন অছিলা বার করে আবার তাকে চাঁদিয়ার ঘরে যেতে হবে। মেয়েটাকে একা বজরঙ্গীর কাছে রাখা নিরাপদ নয়।

ভাবতে ভাবতে ঝাঁকে ঝাঁকে অজুহাত হাতের সামনে এসে যায়। দ্রুত উঠে ফের পাশের ঘরে আসে ধনপত।

বজরঙ্গী বেজায় বিরক্ত হয়ে বলে, 'ফির কা?'

ধনপত কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'নমক নহী।—থোড়েসে দো।' বলেই চাঁদিয়ার দিকে হাত বাড়ায়।

বজরঙ্গী কর্কশ গলায় শুধোয়, 'ভাণ্ডারা থেকে নমক আনিস নি?'

'ভুল গিয়া।' ধনপত ভয়ে ভয়ে উত্তর দেয়। নুন সে অবশ্যই এনেছিল কাল বিকেলে। কিন্তু মিথ্যে না বললে এখানে আসা হয় না।

'কাল জরুর নিয়ে নিবি।'

'জরুর নেব।' বিনীতভাবে জানিয়ে এবং চাঁদিয়ার কাছ থেকে নুন নিয়ে নিজের ঘরে ফিরে আসে ধনপত।

কিন্তু কতক্ষণ আর। একটু পরেই একটা লোটা নিয়ে আবার করুণ মুখে চাঁদিয়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায় ধনপত। বজরঙ্গী ক্ষেপে উঠে কিছু বলার আগেই বলে, 'থোড়েসে পীনেকা পানি।'

বজরঙ্গী খেঁকিয়ে ওঠে, 'শালে কাচ্চীর ওধারে কুয়া রয়েছে, দেখিস নি? অন্ধা কঁহাকা! যা, ওখান থেকে নিগে যা। হারামজাদকা ছৌয়ার হাতে সব তুলে দিতে হবে!'

বার বার এ ঘরে আসার কারণটা ধরে ফেলেছিল চাঁদিয়া। বজরঙ্গীকে কোন রকমেই স্থির হয়ে বসতে বা খারাপ মতলব হাসিল করতে দেবে না ধনপত। চাঁদিয়া বলে, 'এই রাত করে আর কুয়ায় যেতে হবে না। আমার ঘরে পানি আছে, দিচ্ছি।'

জল আনার পরই একে একে 'হরা মিরচি' (কাঁচা লঙ্কা), পরের দিনের ভাত রাখার জন্য বর্তন, এমনি নানা জিনিসের জন্য হানা দেয় ধনপত। তাকে দেখতে দেখতে মাথায় অগুন ধরে যায় বজরঙ্গীর। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'শালে মেজাজটা বিগড়ে দিলে।' বলেই হাতের ওপর

ভর দিয়ে উঠে পড়ে। চাঁদিয়াকে বলে, 'আজ চলি—'

বজরঙ্গী চলে যাবার পর চোখে চোখে হাসে চাঁদিয়া এবং ধনপত। চাঁদিয়া বলে, 'বঁচ গিয়া।'

ধনপত উত্তর দেয় না।

চাঁদিয়া আবার বলে, 'আজকের মতো তো বাঁচলাম। লেকেন কাল পরশু তরশু নরশু কা হোগা? ও আদমিগো আমাকে ছাড়বে না। জরুর ঘুরে ঘুরে আসবে।'

ধনপত বলে, 'ওকে ঠেকাবার জন্যে রোজই মাথা থেকে কিছু না কিছু মতলব বার করতে হবে।'

বিমর্ষ মুখে চাঁদিয়া বলে, 'এভাবে কেত্তে রোজ ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে?'

ধনপত বলে, 'যতক্ষণ পারি।'



পরের দিন সকালে মিশিরজির অফিসে হাজিরা দেবার সময় দেখা গেল, জন দশেক মজুর নেই। বাঘ ভাল্লুক লাকরা এবং অন্যান্য খতরনাক জানোয়ারের ভয়ে রাত্তিরে তারা পালিয়ে গেছে।

এমনিতেই জঙ্গল কাটাইয়ের ব্যাপারে লোকজন পাওয়া মুশকিল। জন্তু জানোয়ারের ভয়ে এ ধরনের কাজে বিশেষ কেউ আসতে চায় না। অনেক চেষ্টা চরিত্র করে যাদের জুটিয়ে আনা হয়েছে তাদের ভেতর থেকেও যদি লোক পালায় তাহলে এই বিশাল বনভূমি কতদিনে সাফ হবে? কবে বসবে সিমেন্টের কারখানা?

মিশিরজি প্রায় ক্ষেপেই ওঠে। তার সাঙ্গোপাঙ্গদের উদ্দেশে বলে, 'ভূচ্চরগুলো ভাগল, আর তোরা টের পেলি না? মরে গিয়েছিলি নাকি রে গিদ্ধরের ছৌয়ারা?'

কাঁচুমাচু মুখে সাঙ্গোপাঙ্গরা জানায় শীতের রাতে মারাত্মক ঘুমে তারা ডুবে গিয়েছিল। মজুররা কখন পালিয়েছে বুঝতে পারেনি।

মিশিরজি চিৎকার করে হুঁশিয়ারি দেয়, 'আজ রাত থেকে নজর রাখবি, কেউ যেন ভাগতে না পারে। সমঝা?'

খানিকটা দূরে ছেষট্টি জন মজুরের ভেতর দাঁড়িয়ে সব শুনছিল ধনপত। সে চমকে ওঠে। ধুরুয়া গাঁয়ে জনমদাসের জীবনে তাদের এতটুকু মুক্তি ছিল না। চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানেরা তাদের চোখে চোখে রাখত। জমি মালিকের এইসব কুত্তাগুলোর চোখে ধুলো ছিটিয়ে কিছু করার ছিল না। এখানে এই পিপরিয়ায় বিশাল অরণ্যের পাশে তেমনই

এক ফাঁদের ভেতর এসে পড়ল নাকি সে?

দিন দশেক কেটে গেল।

এর ভেতর জঙ্গল অনেকটা সাফ হয়ে গেছে। তা ছাড়া ভৈসা গাড়ি বোঝাই হয়ে আরো কিছু মজুর এসে পড়েছে।

ধনপত জানতে পেরেছে, মুনোয়ারপ্রসাদ নামে সেই আড়কাঠিটা পূর্ব এবং উত্তর বিহারের নানা হাটিয়া থেকে নতুন মজুরদের জুটিয়ে এনে ডুমনির্গাও রেল স্টেশনে মিশিরজির হাতে তুলে দিয়ে গেছে। তারপর ডুমনির্গাও থেকে ভৈসা গাড়িতে এখানে। সে টের পেয়েছে, ওভাবে লোক জোটানোই মুনোয়ারপ্রসাদের কাজ।

এদিকে পিপরিয়ার জঙ্গলের ধারে ধনপতদের জীবন একই খাতে বয়ে যাচ্ছে। সকালে উঠে আগের দিনের বাসি রুটি বা পানিভাত্তা খেয়ে কটৌরাতে দুপুরের কালোয়া ভরে জঙ্গলে ছোটা, একটানা কাজের ফাঁকে গোগ্রাসে দুপুরের খাওয়া চুকিয়ে একটু জিরিয়েই আবার কুড়াল চালানো বা কাশের ঝোপে আগুন ধরিয়ে দেওয়া। চারটে বাজলে চারদিক থেকে হুকুমদারদের চিৎকার ওঠে, 'ডিপটি খতম।'

জঙ্গল থেকে ফিরে রান্নাবান্না এবং খাওয়া দাওয়া সারতে সারতে শীতের সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে নেমে আসে। হিমবর্ষী আকাশের নিচে সারাদিন 'গতরচূরণ' খাটুনির পর পেটে দানা পড়তে না পড়তেই মজুরদের চোখ জুড়ে আসে। ক্লান্ত পশুর মতো তারা কম্বলের তলায় ঢুকে যায়। সংক্ষেপে এই হল এখানে তাদের জীবনযাত্রার মোটামুটি নমুনা। মাঝে অবশ্য দিন দুই রাতে নৌটঙ্কীর গান গেয়ে সবাইকে শুনিয়েছে ভানচাঁদ। বেশ সুরেলা 'যাদুভরি' গলা তার। কিন্তু গোটা দিন জীবনীশক্তির অনেকটা অংশ জঙ্গলে ক্ষয় করে আসার পর শরীরে এমন কিছু সারবস্তু আর থাকে না যাতে রোজ রোজ গান-বাজনার উৎসাহ পাওয়া যায়।

এই দশ দিনে জানা গেছে, এক সপ্তাহ বাদে বাদে সবাইকে খোরাকি বাবদ একসঙ্গে সাত দিনের চাল-ডাল-আটা-নিমক ইত্যাদি দেওয়া হবে। কিন্তু এখনও কাউকেই মজুরি বাবদ একটা পয়সাও দেয় নি মিশিরজি।

এ ব্যাপারে ভয়ানক দুশ্চিন্তায় আছে ধনপত। রোজই মজুরির কথাটা 'বলব বলব' ভাবে সে কিন্তু মিশিরজির কাছে গেলেই সব গোলমাল হয়ে যায়। সাহস করে কিছু বলতে পারে না।

এ ক'দিনে একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ধনপত। সেদিন মিশিরজি হুকুম দেবার পর রাতে তার লোকেরা পাহারা দিতে শুরু করেছে। নিজের ঘরে শুয়ে শুয়েই সে টের পায় মাঝরাতে ভোররাতে বা প্রথম রাতে কেউ না কেউ মজুরদের 'বারিকে'র সামনে দিয়ে আস্তে আস্তে হেঁটে যাচ্ছে। মানুষের পৃথিবী থেকে অনেক দূরে বনভূমির ধারে বলে রাতগুলো এখানে বড় বেশি গভীর আর নিস্তব্ধ। এত স্তব্ধতা বলেই হয়ত পায়ের সামান্য আওয়াজ কানে আসে।

এদিকে হুকুমদার বজরঙ্গীর উৎপাত ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জঙ্গলে বিশাল বিশাল পিপর কি সীমারগাছের গায়ে করাত কিংবা কুড়াল চালাতে চালাতে ধনপতের চোখে পড়ে চাঁদিয়ার গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর হেসে হেসে মজার মজার কথা বলছে সে। সারাদিন কাজের পরও রেহাই নেই। সন্ধেবেলায় চাঁদিয়া 'বারিকে' ফিরে এসে রসুই চড়ায়। সেই সময় বজরঙ্গী তার ঘরে হানা দেয়। চাঁদিয়ারই বিছানার একধারে জাঁকিয়ে বসে 'গপসপ' করে, কথায় কথায় খ্যা খ্যা করে হাসে।

বজরঙ্গী যাতে বেশিদূর এগুতে না পারে সেই কারণে রোজই একটা না একটা অছিলা মাথা থেকে বার করে ধনপত। গোবেচারা ভাল মানুষের মতো মুখ করে অত্যন্ত নিরীহ ভঙ্গিতে এমন সব কাণ্ডকারখানা করে যাতে শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বজরঙ্গীকে উঠে যেতে হয়। ধনপত টের পায়, তার ওপর মনে মনে বেজায় ক্ষেপে আছে বজরঙ্গী।

রোজই ধনপত ভাবে, বজরঙ্গীর নামে মিশিরজির কাছে নালিশ করবে। এই নিয়ে চাঁদিয়ার সঙ্গে অনেক পরামর্শও করেছে সে। কিন্তু নালিশ জানাতে গিয়ে যদি হিতে বিপরীত হয়, তাই দু পা এগিয়ে দশ পা পিছিয়ে আসে। তা ছাড়া একটা ব্যাপার তার চোখে পড়েছে, আরও তিন হুকুমদারও মজুরদের আওরতদের পেছনে ঘুর ঘুর করতে শুরু

করেছে।

হয়তো একই প্রথা তুনিয়া জুড়ে সব জায়গায় চালু রয়েছে। গরিব অচ্ছুৎদের ঘরের যুবতী মেয়েরা হয় জমির মালিক, না হয় হুকুমদারদের চিরকালের ভোগের বস্তু।

আজ সকালেও অন্য সবার সঙ্গে জঙ্গলের দিকে চলেছে চাঁদিয়া আর ধনপত। হুকুমদার আগে আগে হাঁটছে। তাদের মধ্যে টহলরামকেও দেখা যাচ্ছে। তার কাঁধে দোনলা বন্দুক। ইদানিং রোজই ধনপতদের সঙ্গে জঙ্গলে যাচ্ছে টহলরাম। যতক্ষণ ধনপতরা গাছ টাছ কাটে ততক্ষণ সে জঙ্গলের এ মাথা থেকে ও মাথায় টহল দিয়ে বেড়ায়। যাতে জানবররা কাছাকাছি না আসে সেজন্য মাঝে মাঝেই বন্দুকটা আকাশের দিকে তুলে ফাঁকা আওয়াজ করে। তাতে গাছপালার মাথা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে মানিক পাখি, বক আর শুগারা উড়ে যায়।

টহলরাম এমনিতে মিশিরজির অফিসের দারোয়ান। তার বন্দুকের নিশানা নাকি অব্যর্থ।

যেতে যেতে চাপা গলায় চাঁদিয়া বলে, 'একগো বাত—'

ধনপত শুধোয়, 'কা বাত ?'

'বহোত বুরা।'

চমকে ওঠে ধনপত, উদ্বিগ্ন মুখে চাঁদিয়ার দিকে তাকায়।

চাঁদিয়া গলার স্বর আরও নামিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, 'হুকুমদার আজ কী বলেছে জানো ?'

'কী ?'

'সন্ধ্যার সময় সে আর আসবে না।'

ধনপত নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বলে, 'তা হলে ভালই হল। তুম বঁচ গিয়া।'

'সবটা শুনেই নাও।' চাঁদিয়া বলতে থাকে, 'হুকুমদার বলেছে রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আসবে। দরবাজায় টোকা দিলে খুলে দিতে বলেছে। অব কা করে হামনি ?'

ধনপতকে এবার ভয়ানক চিন্তিত দেখায়। সে বলে, 'বহোত মুসিবত।'

'ও আদমি আচ্ছা নহী।'

'হাঁ, বহোত খতরনাক।'

একটু চুপচাপ। তারপর চাঁদিয়া শুধোয়, 'কি করব তা তো বললে না—'

খানিকক্ষণ ভেবে ধনপত বলে, 'দরবাজা খুলবে না। দেখি কী করতে পারি।'

কাজ থেকে ফিরে অন্য দিনের মতো আজও খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ল ধনপত। পাশের ঘরেও দরজা বন্ধ করার আওয়াজ পাওয়া গেল।

অন্য সব দিন শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ে ধনপত। আজ রাজ্যের ঘুম তাড়িয়ে চোখ টানটান করে জেগে থাকে সে। বাইরে একটা পাতা খসার শব্দ হলেই তার কান কুকুরের মতো খাড়া হয়ে যায়।

টের পাওয়া যায়, পাশের ঘরেও চাঁদিয়া ঘুমোয় নি। এক সময় ধনপত ডাকে, 'এ চাঁদিয়া—'

দ্বিতীয় বার ডাকতে হয় না, সঙ্গে সঙ্গে সাড়া মেলে। চাপা গলায় চাঁদিয়া বলে, 'হুঁ—'

'এখনও ঘুমোও নি?'

'কা করে, নিদ আসছে না'

'আমারও না।'

খানিকক্ষণ পর পর এই একই কথা হয় দু'জনের।

কতক্ষণ বাদে খেয়াল নেই, হঠাৎ চাঁদিয়ার দরজায় আস্তে টোকা পড়ে। যত আস্তেই হোক, বনভূমির পাশের স্তব্ধ প্রান্তরে শব্দটা বন্দুকের গুলির মতোই কানের পর্দায় ধাক্কা মারে ধনপতের। কম্বলের ভেতর তার হৃদ্‌পিণ্ড মুহূর্তের জন্য যেন থমকে যায়।

ওদিকে চাঁদিয়ার দিক থেকে কোনরকম সাড়া নেই। ধনপত জানে, আওরতটা ভয়ে কাঠ হয়ে বিছানায় পড়ে আছে।

আবার টোকা পড়ে। তারপর বার বার। শেষ পর্যন্ত ধাক্কাই দিতে

শুরু করে বজরঙ্গী। কিন্তু চাঁদিয়া যে জেগে আছে, তার কোন লক্ষণ বোঝা যায় না। ধনপত জানে, সারারাত ধাক্কাধাক্কি করলেও বজরঙ্গী চাঁদিয়ার ঘুম ভাঙাতে পারবে না।

এবার চাপা গলায় বজরঙ্গী বলে, 'কা রে, ওঠ—'

চাঁদিয়ার উত্তর নেই।

বজরঙ্গী ফের বলে, 'বনভৈসীর মতো ঘুম দেখছি তোর। উঠে পড়, উঠে পড়। বাইরে বহোত জাড়। ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে।'

চাঁদিয়া জবাব দেয় না

বজরঙ্গী এতক্ষণে ভয়ানক অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। বলে, 'এ আওরত, এ ভুচ্চর—এত ডাকাডাকি করছি তবু তোর নিদ টুটছে না! মনে করছিস তোর শয়তানি বুঝতে পারছি না? জেগে আছিস, লেকেন উঠছিস না।' আচমকা গলাটা সামান্য চড়িয়ে হুঁশিয়ারি দেয়, 'এখনই দরবাজা খুলে না দিলে ভেঙে ঘরে ঢুকব।'

ধনপত বুঝতে পারে, আর শুয়ে থাকা যাবে না। দ্রুত উঠে পড়ে সে। তারপর কম্বল জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে।

চারদিক কুয়াশা এবং অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সেই দশটা আগুনের কুণ্ড অসহ্য হিমে নিভু নিভু হয়ে এসেছে। সেগুলো দেখে ধনপতের মাথায় হঠাৎ যেন বিজলি খেলে যায়। সে ঠিক করে ফেলে এই 'ঘুর'গুলোকে কাজে লাগাতে হবে।

পাঁচ হাত দূরে চাঁদিয়ার ঘরের সামনে সারা শরীর কম্বলে মুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বজরঙ্গী সিং রাজপুত। শীতের এই হিমবর্ষী মধ্যরাতে ধনপতকে দেখে ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে সে।

আকাশ থেকে পড়ার মতো ভঙ্গি করে ধনপত বলে, 'কা সিংজি, আপ ইহা?'

প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও পরক্ষণে অসহ্য রাগে এবং বিরক্তিতে প্রায় ফেটে পড়ে বজরঙ্গী, 'আমি হুকুমদার, যেখানে যখন খুশি যাব। লেকেন তুই এখানে কেন? এত্তে রাতকো? কা ধান্দা তুহারকা?

'ঘুর'গুলো দেখিয়ে ধনপত বলে, 'ওগুলো নিভে এসেছে। নয়া

লকড়ি দিতে হবে। মিশিরজি বোলাথা ও রোজ—'

কথাটা মনে পড়ে যায় বজরঙ্গীর। সত্যিই বলেছিল মিশিরজি। প্রথম দিন মিশিরজির লোকেরা 'ঘুর' জ্বালিয়ে দিলেও তারপর থেকে মজুরদেরই এই কাজটা করতে হবে। শুধু তাই নয়, রাতে মাঝে মাঝে উঠে তাদেরই কাউকে নিভন্ত অগ্নিকুণ্ডে নতুন কাঠ গুঁজে আগুনটা চাঙ্গা করে তুলতে হবে।

বজরঙ্গী দাঁতে দাঁত ঘষে জেরা করে, 'আজ তোর লকড়ি গোঁজার দিন নাকি?'

'হাঁ।'

'শালে গিদ্ধড়, লকড়ি দেবার আর দিন পেলে না! যা শালে—'

বলে আর দাঁড়ায় না বজরঙ্গী, সোজা অফিস ঘরের দিকে চলে যায়। আজকের রাতটা বৃথাই গেল।

এইভাবে রোজই রাত্তিরে হানা দেয় বজরঙ্গী, আর রোজই একটা না একটা অজুহাতে বাইরে বেরিয়ে এসে তাকে ঠেকায় ধনপত।

বজরঙ্গী ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না, দিন কয়েকের মধ্যেই ধনপতের কৌশলটা ধরে ফেলে সে।

সেদিন সকালে জঙ্গলে যেতে যেতে ধনপতকে একধারে ডেকে নিয়ে ভয়ঙ্কর গলায় বজরঙ্গী বলে, 'আজ রাত্তিরে যদি ঘর থেকে বেরোস, তোকে মাটিতে পুঁতে ফেলব। হোঁশিয়ার—'

ধনপত ভয় পেয়ে যায়। বজরঙ্গীর এমন মূর্তি আগে আর কখনও দেখা যায়নি। বিকেলে কাজ থেকে ফিরে এসে চাঁদিয়াকে বলে, 'আর বোধহয় হুকুমদারকে রোখা যাবে না। আজ রাত্তিরে বেরুলে সে আমাকে খুন করে ফেলবে।'

ভয়ার্ত মুখে চাঁদিয়া বলে, 'তব কা হোগা?'

একটু চিন্তা করে ধনপত বলে, 'এখান থেকে ভাগতে হবে। লেকেন হোঁশিয়ার, কেউ যেন টের না পায়।'

তারপর দু'জনে পরামর্শ করে পালাবার পরিকল্পনা ছকে ফেলে।

আজ রাত্তিরে সবাই শুয়ে পড়লে, বজরঙ্গী আসার আগেই তারা এখান থেকে উধাও হয়ে যাবে। এখন তাদের একটা মাত্র কাজ, মিশিরজির কাছ থেকে এ ক'দিনের কাজের মজুরি আদায় করে নিতে হবে।

ধনপত বলে, 'নাহানা চুকিয়ে মিশিরজির কাছে যাই, মজুরির কথাটা বলি—'

'মজুরি আদায় করে চলে যাব, এ কথা বলবে নাকি মিশিরজিকে?' উদ্বিগ্ন চোখে ধনপতের দিকে তাকায় চাঁদিয়া।

'আরে নহী, নহী—'

ধনপত অত্যন্ত ব্যস্তভাবে বলে, 'যাবার কথা বললে একগো পাইসাও দেবে না মিশিরজি। বহোত ঝামেলায় ফেলে দেবে আমাদের।'

'আমার পাইসা তো তোমাকে দেবে না। সঙ্গে যাব তোমার?'

'নহী। আগে আমার কথাটা বলি। তেমন বুঝলে পরে তোমাকে পাঠাব।'

কিছুক্ষণ পর কুয়োর জলে 'নাহানা' চুকিয়ে পরিষ্কার জামা-কাপড়ের ওপর কম্বল চাপিয়ে সোজা অফিস ঘরে চলে আসে ধনপত। মিশিরজিকে অফিসেই পাওয়া যায়।

মিশিরজি প্রথম প্রথম মজুরদের 'তুমি' করেই বলতো। এখন তুই তোকারি করে। ধনপতকে দেখে সে বলে, 'কা রে, কা ধান্দা?'

ভয়ে ভয়ে ধনপত বলে, 'একেগা বাত—'

'কা বাত?'

ধনপত মজুরির কথা বলে।

খানিকক্ষণ স্থির চোখে তাকিয়ে থাকার পর সন্দিগ্ধভাবে মিশিরজি শুধোয়, 'মজুরির পাইসা দিয়ে কি হবে?'

মিশিরজি এরকম প্রশ্ন করবে, ভাবতে পারেনি ধনপত। প্রথমটা সে হকচকিয়ে যায়। তারপর বলে, 'ঘরমে ভেজেগা।'

মিশিরজি বলে, 'পাঠাবি কী করে? এখানে ডাকঘর নেই। তা ছাড়া—'

'কা?'

'মজুরির পাইসা এখন পাবি না। জঙ্গল সাফাই হলে পুরা পাইসা একসাথ পেয়ে যাবি। সমঝা?'

কত দিনে জঙ্গল সাফাই হবে তার ঠিকঠিকানা নেই। ধনপত ভেতরে ভেতরে ভয়ানক দমে যায়।

মিশিরজি ফের বলে, 'রাতকা ভোজন হো গিয়া?'

'নহী—'

'যা। সারাদিন খেটে এসেছিস। খেয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

ধনপত ফেরার জন্য ঘুরে দাঁড়িয়েছিল, মিশিরজি ডাকে, 'একগো বাত শুনে যা—'

ধনপত ঘাড় ফেরায়, 'কা?'

সোজা তার চোখের দিকে তাকিয়ে মিশিরজি প্রশ্ন করে, 'পাইসা হাতে পেলে সবাই ভাগার চেষ্টা করে। তাই আমরা আগে কাউকে পাইসা দিই না। সমঝা?'

বিমর্ষ দেখায় ধনপতকে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে সে।

মিশিরজি বলতে থাকে, 'তুই ভাগবার মতলব করেছিস নাকি?'

লোকটা কি বুকের ভেতর পর্যন্ত দেখতে পায়? ধনপত চমকে ওঠে। জোরে জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে রুদ্ধ গলায় বলে, 'নহী, নহী—'

স্থির চোখে তাকিয়ে থাকে মিশিরজি। আস্তে আস্তে বলে, 'তোদের সাথ কোম্পানির 'কনটেরাক্ট' হয়ে গেছে, ছাপানো কাগজে অঙ্গুঠার টিপছাপ দিয়েছিস। কাম পুরা না হলে এখান থেকে কারও পালাবার উপায় নেই। সমঝা?'

কাঁপা গলায় ধনপত বলে, 'সমঝ গিয়া মিশরজি।'

'অব যা—'

ফিরে এসে মিশিরজির সঙ্গে যা কথাবার্তা হয়েছে সব চাঁদিয়াকে জানায় ধনপত। চাঁদিয়া বলে, 'অব কা হোগা?' তাকে খুবই চিন্তিত দেখায়।

ধনপত এর মধ্যে মনস্থির করে ফেলেছে। সে বলে, 'তোমার সঙ্গে তখন যা কথা হয়েছে তা-ই করতে হবে। আজই আমরা পিপরিয়া থেকে

চলে যাব। তুরন্ত খাওয়া চুকিয়ে জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও।'

'আমরা সঙ্গে করে কিছুই আনিনি। এ সব কম্বল বর্তন-উর্তন ত মিশিরজির।'

'মিশিরজির ওপর তোমার খুব টান দেখছি।' তীব্র গলায় ধনপত বলে, 'সে আমাদের মজুরির পাইসা দিয়েছে? একগো জিনিসও ফেলে যাবে না। ওরা যা দিয়েছে সব বেঁধে নেবে মজুরির পাইসা এভাবে যতটা তোলা যায়।'

'ঠিক হ্যায়।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে মজুরদের ঘরে ঘরে আলো নিভে যায়। চারদিক দ্রুত নিস্তব্ধ হতে থাকে। ঝিঁঝির ডাক এবং থেকে থেকে কামার পাখিদের চিৎকার ছাড়া পৃথিবীর কোথাও এখন আর কোন শব্দ নেই।

তবু চাঁদিয়া আর ধনপত রুদ্ধশ্বাসে আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। তারপর রাত যখন আরো গভীর হয়, বাতাসে কুয়াশা আরো গাঢ় হতে থাকে, সেই সময় দু'জনে কাঁধে দুটো বড় পুঁটলি চাপিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু মজুর ব্যারাকের শেষ ঘরটা পেরুবার আগেই কে যেন রাতের আকাশ ফেঁড়ে চিৎকার করে ওঠে, 'ভাগতা হ্যায়, ভাগতা হ্যায়।—রুখ যা, রুখ যা।'

ধনপতরা জানে না, পাহারাদারদের চোখে ধুলো ছিটিয়ে এখান থেকে পালানো প্রায় অসম্ভব।

প্রথমটা মারাত্মক ভয়ে দু'জনে সিঁটিয়ে যায়। কি করবে, বুঝতে না পেরে দিশেহারা হয়ে পড়ে।

টের পাওয়া যাচ্ছে, পাশের লোকটার চিৎকারে অফিসের ওধারের ঘরগুলো থেকে অনেকেই বেরিয়ে পড়েছে। তারা হৈচৈ বাধিয়ে ছুটে আসছে, 'পাকড়ো শালে লোগকো, পাকড়ো—পাকড়ো—'

মুহূর্তে ধনপতের সারা শরীরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি লাগে যেন। চাপা গলায় সে চাঁদিয়াকে বলে, 'যত জোরে পার দৌড়তে থাকো। ওরা ধরতে পারলে খতম করে দেবে।'

দু'জনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো সামনের দিকে ছুটতে থাকে।

পেছনের লোকগুলো ঊর্ধ্বশ্বাসে তাড়া করে আসছে। ছুটতে ছুটতে অন্য এক বাত্রির কথা মনে পড়ে যায় ধনপতের। চন্দ্রিকা সিং রাজপুতের পাহ্লোয়ানদের তাড়া খেয়ে এইভাবেই তাকে পালাতে হয়েছিল।

খানিকটা ছুটবার পর ধনপত বুঝতে পারে, কাচ্চা ধরে সোজা ছুটলে চলবে না। পেছনের লোকগুলো আর তাদের মধ্যে দূরত্বটা দ্রুত কমে আসছে। তার কারণও আছে। প্রথমত একটা আওরৎকে সঙ্গে নিয়ে তাকে ছুটতে হচ্ছে। যত জোরেই ছুটুক, চাঁদিয়ার পক্ষে পুরুষের মতো দৌড়নো সম্ভব নয়। হাজার হোক, সে একটা আওরৎ। ক'দিন আগে দধিপুরায় অধিকলাল চৌবে আর তার সঙ্গী সাত আটটা গিধ চাঁদিয়ার শরীরটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত করে প্রায় নদাতে ছুঁড়ে ফেলছিল। ইজ্জতের সওয়ালে তার যে মর্মান্তিক ক্ষতি হবার তা ত হয়েই গেছে কিন্তু দৈহিক ক্ষতিটা তার চাইতে একটুকু কম নয়। শরীর তার এখনও ঠিকমতো সেরে ওঠে নি। তবু এর মধ্যেই জঙ্গল কাটাইয়ের মতো 'গতর চূরণ' খাটুনি শুরু করতে হয়েছিল।

দু'জনের জোরে দৌড়তে কষ্ট হচ্ছিল, কেননা তাদের কাঁধে রয়েছে অবস্তব মালপত্রের বোঝা।

ধনপত চাপা গলায় বলে, 'সামান ফেলে দাও, সামান ফেলে দাও—'

পার্থিব সম্পত্তি সেটুকু আছে তা ফেলে দিলে পরে তাদের চলবে কী করে? ছুটতে ছুটতেই বিমূঢ়ের মতো চাঁদিয়া শুধু বলে, 'ফেলে দেব!'

শশব্যস্তে চেঁচিয়ে ওঠে ধনপত, 'হাঁ হাঁ, আভি ভি দের নায় করনা।'

চাঁদিয়া মালপত্র ফেলে না। শুধু বলে, 'লেকেন -'

তার দ্বিধা, কারণটা বুঝতে অসুবিধা হয় না ধনপতের। কিন্তু ভারমুক্ত না হলে ছোটার গতি বাড়ানো যাবে না, ফলে যে কোন মুহূর্তে ধরা পড়বার সম্ভাবনা। ধনপত তাড়া লাগায়, 'ফেলে দাও—

ফেলে দাও—' বলে কাঁধ থেকে নিজের পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে ধনপত।

অগত্যা, অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের বিরাট বোঁচকাটা ফেলে দিতে হয় চাঁদিয়াকে।

ধনপত বলে, 'এবার ধানক্ষেতে নেমে যাও।'

দু'জনেই ধানক্ষেতে নেমে পড়ে, তারপর আঁকাবাঁকা উঁচু আল ধরে দৌড়তে থাকে। কিন্তু মিশিরের লোকজনের একেবারে নাছোড়বান্দা শুওরের গোঁ, তারাও পেছন পেছন ধাওয়া করে আসছে।

ছুটতে ছুটতে আচমকা গর্তে পা ঢুকে যেতে হুমড়ি খেয়ে আলের তলায় ধানক্ষেতে পড়ে যায় চাঁদিয়া। তার গলা থেকে কাতর গোঙানির মতো আওয়াজ বেরিয়ে আসে, 'মর গিয়া —'

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ায় ধনপত। তার হৃৎপিণ্ডের ওঠা-নামা হঠাৎ থেমে যায়। পরক্ষণেই শরীরের সমস্ত শক্তি দুই পায়ে জড়ো করে দৌড়তে থাকে।

মাঝরাতে ধনপত একটা নির্জন হাটে এসে পৌঁছয়। কোথাও কেউ নেই। না একটা মানুষ, না একটু আলো। চারদিক একেবারে হা হা করছে।

এই মধ্যরাতে কুয়াশা এত ঘন যে দু'হাত দূরের কিছুই পরিষ্কার দেখা যায় না। আকাশে হয়ত চাঁদ আছে কিন্তু ঘন সাদা কুয়াশার ভেতর দিয়ে দিয়ে চুঁইয়ে তার এক ফোঁটা আলোও এখানে এসে পৌঁছয় নি। সমস্ত চরাচর গাঢ় হিমের তলায় একেবারে কুঁকড়ে আছে।

যেদিকেই তাকানো যাক, সমস্ত হাটটা জুড়ে অগুণতি চালা সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে। চালাগুলোর মাথায় ফুটিফাটা টিন বা টালির ছাউনি, চারপাশ একেবারে উদোম—বেড়া টেডা কিছুই নেই। মেঝের মাটি পৌষের মারাত্মক হিমে জমাট বেঁধে আছে।

বরফের চাকের মতো ঠাণ্ডা কনকনে মেঝেতে শোওয়া যায় না। অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটা চালার তলায় বাঁশের লম্বাটে বেঞ্চি

চোখে পড়ে ধনপতের। বেঞ্চিটা কী উদ্দেশ্যে কারা বানিয়েছিল, সে সব ভাবার এখন সময় নয়। তার শরীরে এক ফোঁটা শক্তিও আর অবশিষ্ট নেই, সবটুকু তাগদ ক্ষয় করে মরিয়া হয়ে সে এতদূর ছুটে এসেছে। ফসল-কাটা ফাঁকা মাঠ এবং ঝোপঝাড় জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কত মাইল তাকে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে হয়েছে, ধনপত জানে না। শুধু তার মনে হচ্ছে, এতটা দৌড়নোর ধকলে তার হাত-পায়ের জোড় আলগা হয়ে যাচ্ছে। ছিঁড়ে পড়ছে কাঁধ ঘাড় এবং কোমরের হাড়। তা ছাড়া অসহ্য ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে সারা দেহের রক্ত-মাংস।

ধনপত এক মুহূর্তও আর দাঁড়ায় না। কিংবা নিজের অজান্তেই হয়তো তার শরীর ভেঙেচুরে হুড়মুড় করে বাঁশের বেঞ্চিটায় পড়ে যায়।

ধনপতের গায়ে রয়েছে খেলো জ্যালজেলে জামা-প্যান্টের ওপর রোঁয়াওলা উলের ধুসো সোয়েটার এবং পাতলা একটা চাদর। কোনো রকমে চাদরটায় মাথা এবং মুখ মুড়ে নেয় সে। এরপর আর তার হুঁশ থাকে না।

চারদিক থেকে পোষের বাতাস ধনপতের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে থাকে। মাটির কোটি কোটি ছিদ্র দিয়ে উঠে আসতে থাকে অজস্র হিম। এরই মধ্যে বুকের ভেতর হাঁটু গুঁজে কুণ্ডলী পাকিয়ে বেহুঁশ পড়ে থাকে ধনপত।



পরদিন পাখির ডাক এবং কুকুরের চিৎকারে ঘুম ভাঙে ধনপতের। চোখ মেলতেই দেখা যায়, বেলা বেশ চড়ে গেছে। পুব আকাশের ঢালু দেওয়াল বেয়ে বেয়ে সূর্য অনেকটা ওপরে উঠে এসেছে। দূরে মাঠ এবং ঝোপঝাড়ের মাথায় নরম রেশমের মতো কুয়াশার পর্দা। সেই কুয়াশা ছিঁড়ে খুঁড়ে অঢেল মায়াবী রোদের ঢল নেমে আসছে। এধারে ওধারে গাছপালার মাথায় প্রচুর পাখি উড়ছে—পরদেশি শুগা, মানিক পাখি, চোটা, কাক, এমনি অনেক। এ ছাড়া ধনপতের চালাটার ঠিক নিচেই আট দশটা কুকুর একটা মরা চড়াইয়ের দখল নিয়ে তুমুল চেঁচামেচি আর কামড়াকামড়ি করে যাচ্ছে।

প্রথমটা ধনপত বুঝতে পারল না, এখানে কীভাবে এসেছে। একটু পরেই তার সব মনে পড়ে গেল। নির্জন হাটের চালায় বাঁশের বাখিতে বসে কাল রাতের ঘটনাগুলো তার চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগল। কাল নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারে নি ধনপত। কিন্তু এই মুহূর্তে চাঁদিয়ার মুখটা বার বার তার মনে পড়তে লাগল। যে মেয়েটা তার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করেছিল তাকে একপাল গিধের মুখে ফেলে ওভাবে পালিয়ে আসা ঠিক হয় নি। তাকে ধরতে পারলে মিশিরজির লোকেরা নিশ্চয়ই মাটির তলায় জ্যান্ত পুঁতে ফেলত। তবু পিপরিয়ার একটা অসহায় মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে মনে মনে হাজার বার নিজেকে ধিক্কার দেয় ধনপত। সে

ভীরু, কাওয়ার, পুরুষানুক্রমে বেগার খেটে তার মেরুদণ্ড কবেই ভুমড়ে গেছে, ধ্বংস হয়েছে সাহস এবং মনের জোর। আচমকা তার রক্তস্রোতে কিসের যেন বিস্ফোরণ ঘটে যায়। আজই সে পিপরিয়ায় যাবে, যেমন করে হোক চাঁদিয়াকে ওখান থেকে নিয়ে আসতে হবে।

বাঁশের চালি থেকে নামতে গিয়ে ধনপত টের পায় তার হাত-পা ঠাণ্ডায় একেবারে জমে আছে। সে যে এখনও বেঁচে আছে, এটাই এক বিস্ময়কর ঘটনা।

আস্তে আস্তে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে আড়ষ্টতা কাটিয়ে নেয় সে। দু হাত ঘষে ঘষে শরীরে বাড়তি উত্তাপ নিয়ে আসে। তারপর নিচে নামে।

এত বেলাতেও হাট একেবারে ফাঁকা, লোকজন দেখা যাচ্ছে না। বোঝাই যায় আজ হাটের দিন নয়।

শূন্য চালাগুলোর পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একসময় ধনপত বুঝতে পারে, তার পেটে আগুন জ্বলছে। কিছু না খেলে বেশিক্ষণ সে হাঁটতে পারবে না।

হাটের চৌহদ্দি পেরিয়ে আসার পর ধনপতের চোখে পড়ে চারদিকে শুধু ফসলহীন ধু-ধু মাঠ। কোথাও মানুষজন বা দেহাত দেখা যায় না। কোন দিকে গেলে গ্রাম পাওয়া যাবে সে বুঝে উঠতে পারে না।

ধনপত হঠাৎ দাঁড়িয়ে যায়। সামনে পেছনে ডাইনে এবং বাঁয়ে একবার তাকায়। তারপর কী ভেবে মাঠ ভেঙে সোজাসুজি হাঁটতে শুরু করে। ফসলের জমি যখন আছে তখন আশেপাশে গাঁ-ও নিশ্চয়ই আছে। মানুষ ত দশ বিশ মাইল দূর থেকে জমি চষতে বা ফসল কাটতে আসে না।

মাইল দুয়েক হাঁটার পর সূরয যখন আরো ওপরে উঠে এসেছে, রোদের তেজ সামান্য বেড়েছে, সেই সময় ধুঁকতে ধুঁকতে ছোটখাটো একটা গেঁয়ো বাজারে এসে পড়ে ধনপত।

বিহারের অন্য গাঁ-গুলোতে যেমন দেখা যায়, এ বাজারটা তার থেকে আলাদা কিছু না। কাচ্চী বা কাঁচা সড়কের ওপর দশ বারোটা

দোকান গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছে। দোকানগুলোর কোনোটা মুদিখানা, কোনোটা চায়ের, কোনটা সস্তা মিঠাইয়ের ইত্যাদি। রাস্তার উল্টোদিকে একটা ঝাঁকড়া-মাথা পিপর গাছ, সেটার তলায় চার-পাঁচটা বয়েল গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। বয়েলগুলো গাড়ির সঙ্গে জোতা নেই, সড়কের নিচে যে ঘাসের মাঠ রয়েছে সেখানে চরে বেড়াচ্ছে। সওয়ারি পাওয়া গেলে ওগুলোকে এনে গাড়ির সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। গাড়োয়ানেরা গাড়িতে বসে রোদ পোহাচ্ছে আর হাতের তেলোতে খৈনি ডলতে ডলতে কথা বলছে। ওদের ঠিক পাশেই এক নাপিত তার এক খদ্দেরের মাথা পরিষ্কার চেঁছে সযত্নে মোটা একটি টিকি বার করছে। নাপিতের পাশেই হতচ্ছাড়া চেহারার একটা লিট্টির দোকান। মাথার ওপর ছাউনি টাউনি নেই। স্রেফ গাছতলায় বসে একটা লোক চিমটে দিয়ে উনুনের গনগনে আঁচে গোল গোল লিট্টি সেঁকছে।

বাজারে ঢুকতেই যান্ত্রিক নিয়মে ধনপতের হাত তার কোমরের কাছে চলে যায়। ধুরুয়া গাঁ থেকে কয়েক দিন আগে সে যখন মুক্তির দাম জোগাড় করতে বেরোয় সেই সময় মা-বাবা ক'টা টাকা তাকে দিয়েছিল। ধলিগঞ্জের হাটিয়ায় নিজের এবং চাঁদিয়ার জন্য চা আর পাঁউরুটি কিনে সামান্য কিছু খরচ করেছিল। তারপর ত মুনোয়ার-প্রসাদের সঙ্গে পিপরিয়াতেই চলে গেল। জঙ্গল কাটাইয়ের ঠিকেদাররা তাদের দায়িত্ব নেবার পর আর খরচ টরচ হয়নি। কাজেই বাকি টাকা থেকেই গেছে। পিপরিয়া থেকে কাল রাতে তারা যখন বেরোয় বাকি টাকাটা ফুল প্যান্টে'র কোমরের পটির ভেতর পুরে নিয়েছিল। যদিও বাড়তি জামা-কাপড়, কম্বল, সবই তাকে ফেলে আসতে হয়েছে, টাকাটা সঙ্গেই আছে। কোমরে হাত দিয়ে ধনপত অনেকটা আরাম বোধ করল।

মিঠাইয়ের দোকানে নোংরা কাঠের বারকোষে থরে থরে সাজানো রয়েছে আটার তৈরী কালচে বালুসাই নিমকিন বুন্দিয়া জিলাবি আর সমোসা। খাবারগুলোর ওপর ধুলোর সিকি ইঞ্চি পুরু আস্তর। আর রয়েছে ঝাঁকে ঝাঁকে ভনভনে মাছি। বালুসাই টাই দেখে জিভে জল

এসে যায় ধনপতের, চোখদুটো চকচকিয়ে ওঠে। পরক্ষণেই দামের কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে গুটিয়ে যায়। যে সামান্য ক'টা টাকা তার কাছে রয়েছে তাতে বালুসাই খাওয়ার বিলাসিতা মানায় না। দামী দামী খাবার খেয়ে টাকাটা উড়িয়ে দিলে চলবে কি করে? কবে সে কাজটাজ পাবে, কবে পয়সা কামাই করতে পারবে, তার কোন ঠিক নেই। যতদিন কিছু একটা না জুটছে, এই সামান্য টাকা ক'টাই তার ভরসা।

শেষ পর্যন্ত পিপর গাছের তলায় লিট্টিওলার কাছেই চলে যায় ধনপত। আট আনায় গরম গরম চারটে লিট্টি কিনে উবু হয়ে বসে খেতে শুরু করে।

খাওয়া শেষ হলে লিট্টিওলার কাছ থেকেই এক লোটা জল চেয়ে ঢক ঢক করে খেয়ে নেয়। সবজির পুর দেওয়া আটার ডেলার ভার অনেকটা সময় এখন পেটে থাকবে। আপাতত সন্ধ্যে পর্যন্ত কিছু না খেলেও চলে যাবে।

পেটটা ঠাণ্ডা হতেই আচমকা চাঁদিয়ার কথা আবার মনে পড়ে যায় ধনপতের। তার কথা আজ সকালেও ঘুম ভাঙার পর একবার ভেবেছে সে। হঠাৎ দুর্জয় এক সাহস যেন তার ওপর ভর করে। যেমন করেই হোক, চাঁদিয়াকে পিপরিয়ার ঠিকাদারদের ফাঁদ থেকে বার করে আনতে হবে, আনতেই হবে।

কিন্তু পিপরিয়া কোথায় ধনপত জানে না। কাল রাতে কীভাবে কোনদিকের মাঠ-জঙ্গল ভেঙে ফাঁকা হাটে চলে গিয়েছিল, মনে নেই। কুয়াশায় অন্ধকারে এবং হিমে সমস্ত চরাচর যখন ঝাপসা আর আড়ষ্ট হয়ে আছে তখন রাস্তাঘাট চিনে রাখা অসম্ভব। তা ছাড়া নিজের প্রাণ বাঁচানো ছাড়া অন্য কোন দিকে লক্ষ্যও ছিল না ধনপতের। সে লিট্টিওলাকে শুধোয়, 'ভেইয়া, পিপরিয়া কঁহা, বলতে পারো?'

'হাঁ হাঁ, জরুর—' লিট্টিওলা হাত তুলে উত্তর দিকটা দেখাতে দেখাতে বলে, 'উধার—'

'কেত্তে দূর?'

'হোগা লগভগ দো তিন 'মিল'—'

পিপরিয়াগামী রাস্তা সম্পর্কে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো কিছু জানার ইচ্ছা ছিল ধনপতের কিন্তু সে সুযোগ আর পাওয়া যায় না। এর মধ্যে লিট্টির দোকানে আরো ক'জন খদ্দের এসে হাজির হয়। তাদের নিয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়ে লিট্টিওলা।

অগত্যা দাম মিটিয়ে উঠে পড়ে ধনপত। লিট্টিওলা যে দিকটা দেখিয়ে দিয়েছিল সেদিকেই হাঁটতে থাকে সে।

বাজারের পাশের সেই কাঁচা সড়কটা বরাবর উত্তর দিকে চলে গেছে। বিহারের এইসব দেহাতের রাস্তাঘাটের চেহারা যেমন হয় কাচ্চীটাও অবিকল তাই—শুধু ধুলো আর ধুলো। হাঁটুভর ধুলো মাড়িয়ে মাড়িয়ে ধনপত এগিয়েই যায়। এদিকে পোষের সূর্য এতক্ষণে খাড়া মাথার ওপর এসে উঠেছে যদিও কনকনে উত্তুরে হাওয়া বয়ে যাচ্ছে দু'ধারের ফাঁকা ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে তবু রোদের তেজ বাড়ায় আরামদায়ক একটু উষ্ণতাও টের পাচ্ছে ধনপত। হাঁটতে ভালই লাগছে তার। তবে পিপরিয়ার দিকে যত এগুচ্ছে, ভেতরে ভেতরে উৎকণ্ঠাটা ততই বেড়ে চলেছে। সে নিজে ত পালাতে পেরেছিল। কিন্তু ধরা পড়ার পর চাঁদিয়ার কী হাল হয়েছে, তাকে মিশিরজির লোকেরা পিটিয়ে মেরে ফেলেছে কিনা, কিংবা বেঁচে থাকলে তার ওপর কতটা পাহারাদারি চলছে, আদৌ তার সঙ্গে দেখা করা যাবে কিনা, ইত্যাদি নানা দুশ্চিন্তায় এবং আকণ্ঠ উদ্বেগে ধনপতের ভেতরটা তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে।

লিট্টিওলা বলেছিল মোটামুটি দু-তিন মাইল হাঁটলেই পিপরিয়া পৌছনো যাবে। কিন্তু দেহাতের মানুষের মাইলের হিসাব বেজায় গোলমেলে। প্রায় মাইল আটেক পেরুবার পর সূর্য যখন পছিমা আকাশের নিচের দিকে ঘন গাছগাছালির ওপারে নেমে গেছে সেই সময় ধনপত পিপরিয়া পৌঁছে যায়।

প্রথমেই সে জঙ্গল-কাটাইয়ের ঠিকাদারদের সেই ব্যারাকগুলোর দিকে যায় না। আগে হালচাল বুঝে নিতে হবে। তারপর খুব হুঁশিয়ার হয়ে তাকে এগুতে হবে। ঝোঁকের মাথায় বা আবেগের

বশে হুট করে কিছু করে বসা ঠিক নয়। তাতে তারও ক্ষতি, আর চাঁদিয়া যদি এখনও বেঁচে থাকে, সেও বিপন্ন হয়ে পড়বে।

ব্যারাকগুলো ডাইনে রেখে অনেকটা ঘুরে জঙ্গলের দিকে চলে যায় ধনপত।

উত্তর দিকে মাইলের পর মাইল চাপ-বাঁধা জঙ্গল। বাকি তিন দিকে ফাঁকা শুনসান মাঠ। জঙ্গলের দিকে গেলে ঘন গাছপালার আড়ালে লুকোবার সুবিধা। ফাঁকা জায়গায় কারো না কারো চোখে পড়ে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যায়। ধনপত অতটা ঝুঁকি নিতে পারবে না।

জঙ্গলে ঢুকতেই লোকজনের গলা শুনতে পায় ধনপত। অর্থাৎ গাছকাটা চলছে। সে দ্রুত একটা বিশাল সিমার গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ায়। মোটা গুঁড়ির পেছন থেকে অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে মুখ বাড়িয়ে চারপাশ লক্ষ্য করতে থাকে।

হঠাৎ ধনপতের চোখ পড়ে, খানিকটা দূরে বুনো কুলের ঝাড়ের ওধারে মজুররা গাছ কাটছে। অনরবত কুড়ুল এবং করাত চালাবার শব্দ আসছে। সেই সঙ্গে কথাবার্তার আওয়াজ। মাঝে মাঝে হুকমদারের হাঁকার, 'গপড়উপ বন্ধ্ করে হাত চালা শালেলোগ—'

হুকুমদারের গলার স্বরটা খুবই চেনা ধনপতের। লোকটা আর কেউ না—স্বয়ং বজরঙ্গী। ধনপতের বুকের ভেতরটা ধক করে ওঠে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে সে তাকিয়েই থাকে, যদি কোথাও চাঁদিয়াকে দেখতে পায়। কিন্তু না, কোথাও নেই মেয়েটা।

বেশ কিছুক্ষণ পর কুশের জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে ভানচাঁদকে দেখতে পায় ধনপত। লোকটা প্রাণপণে, শরীরের সমস্ত শক্তিতে একটানা করাত চালিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই দেখা যায় বজরঙ্গীকে, সে বাঁ হাতের তালুতে খৈনি ডলতে ডলতে এধারে ওধারে ঘুরে জঙ্গল কাটাই তদারক করছে।

এ ছাড়া আরো দু-চারজনকে দেখা যাচ্ছে কিন্তু তারা সবাই পুরুষ কিন্তু একটা মেয়েও নজরে পড়ছে না। আজ কি তবে আওরতরা

জঙ্গল কাটতে আসে নি?

কুল জঙ্গলের ওধারে পলকহীন তাকিয়ে থাকতে থাকতে ধনপতের মনে হয়, চাঁদিয়া হয়ত বেঁচে আছে। একটা খুনটুন কিছু হয়ে গেলে এখনকার আবহাওয়াই বদলে যেত আর যা-ই হোক, বজরঙ্গী এভাবে অন্তত বৈনি ডলতে ডলতে নজরদারি করতে পারত না।

দিনের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে আসছে। বনভূমির মাথায় শীতের শেষ বেলায় যে আবছা নিস্তেজ আলোটুকু আটকে আছে তার আয়ু আর কতক্ষণ? একটু পরেই ঝপ করে কালচে ডানায় চরাচর ঢেকে দিয়ে শীতের সন্ধ্যে নেমে আসবে।

জঙ্গলের মাথায় হাজার হাজার পাখি একটানা চেঁচামেচি করে চলেছে। সারাদিন টো টো করে দুনিয়া ঘুরে ফিরে আসছে তারা। অগুণতি পোকামাকড় ধনপতের গায়ের ওপর উড়ে উড়ে এসে পড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তাকে চারদিক থেকে ছেঁকে ধরছে। গায়ের সবটুকু রক্ত শুষে না নিয়ে ওরা বুঝি তাকে ছাড়বে না।

গলা দিয়ে টুঁ শব্দটি বার না করে দাঁতে দাঁত চেপে অপেক্ষা করতে থাকে ধনপত।

আরো কিছুক্ষণ পর লম্বা পায়ে যখন সন্ধ্যে নামতে থাকে, সেই সময় বজরঙ্গীর চিৎকার শোনা যায়। গলা অনেক উঁচুতে তুলে সে চেঁচাতে থাকে, 'আজ কাম বন্ধ্। সব কোঈ ঘরমে লৌট যা-আ—আ—' তার হুকুম জঙ্গলের ভেতর দিয়ে উত্তুরে হাওয়ার পিঠে চড়ে চারদিকে ছড়িয়ে যেতে থাকে।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যায়, কাতার দিয়ে জঙ্গল কাটানেরা কুলের ঝাড়গুলোর ওধার থেকে বেরিয়ে আসছে। সবার সামনে রয়েছে বজরঙ্গী, তারপর কুড়ুল দা বা করাত হাতে পুরুষেরা, তারপর মেয়েরা, সবার শেষে আবার কিছু পুরুষ দলটার পাশে পাশে বড় বড় পা ফেলে আসছে আখাম্বা চেহারার দুটো পাহারাদার। তাদের কাঁধে ভারী দোনলা বন্দুক, বুকে টোটার মালা। হিংস্র খতরনাক জানোয়ারদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য এই বন্দুকওলারা জঙ্গল

কাটনিদের পাহারা দেয়।

পুরুষ এবং আওরতদের বিরাট দলটা ধনপতের সিমার গাছটার দশ হাত তফাত দিয়ে ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যায়। চোখ টান করে রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে থাকে ধনপত।

একে একে সবাই চলে যাচ্ছে, এমন কি মেয়েদের দঙ্গলটাও। কিন্তু চাঁদিয়া নেই। ধনপত যখন আশা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে, গভীর নৈরাশ্যে তার মন ভরে গেছে, তখনই আওরতগুলোর মাঝখানে চাঁদিয়াকে দেখতে পায়। সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের উত্থান-পতন হাজার গুণ বেড়ে যায়। রক্তের ভেতর উথলপাথল স্রোত ছুটতে থাকে। চাঁদিয়া বেঁচে আছে, চাঁদিয়া বেঁচে আছে।

নিজের অজান্তেই প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল ধনপত, পরক্ষণেই হুঁশ ফিরে পায় সে, হাত দিয়ে তক্ষুণি নিজের মুখটা চেপে ধরে। সে এখানে মাত্র দশ হাত দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে, বজরঙ্গীরা জানতে পারলে তার ফলাফল হবে মারাত্মক। মেয়েদের দলটা চলে যাবার পর ছড়িয়ে ছিটিয়ে আরো ক'টি পুরুষ ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসতে থাকে। ওদের থেকে খানিকটা দূরে, কিছুটা দলছুটের মতো আসছিল রামবনবাস। জগতের সব কিছু সম্পর্কে উদাসীন, বৃক্ষপ্রেমিক এই মানুষটিকে মোটামুটি ভালই লেগেছিল ধনপতের। মনে হয় সে বিশ্বাসযোগ্য। যে মানুষ গাছ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না, সে আর যা-ই করুক ক্ষতি অন্তত করবে না। তা ছাড়া কাউকে না কাউকে বিশ্বাস করতেই হবে। অন্যের সাহায্য ছাড়া চাঁদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করা আদৌ সম্ভব না।

ধনপত গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে ডাকে, 'রাম ভেইয়া, রাম ভেইয়া—'

রামবনবাস থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, এদিক সেদিক তাকায় কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না।

ধনপত ফের ডাকে, 'ভেইয়া—ইধর—'

এবার চোখে পড়ে যায় রামবনবাসের। ধনপত হাতের ইশারায়

তাকে কাছে যেতে বলে।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকে রামবনবাস। ধনপতকে এই জঙ্গলের ভেতর এভাবে দেখবে, সে যেন ভাবতে পারে নি। 'আরে তুম!' বলে দ্রুত সিমার গাছের দিকে এগিয়ে যায়।

ওধারে জঙ্গল কাটাইয়ের দলটা অনেক দূরে চলে গেছে। বজরঙ্গী বা তার পাহারাদাররা কেউ লক্ষ্য করে নি, রামবনবাস জঙ্গলেই থেকে গেছে।

কাছে এসে রামবনবাস আবার বলে, 'তুমি এখানে এলে কী করে? কাল না পালিয়ে গিয়েছিলে!' বলতে বলতে বিস্ময় কেটে গিয়ে প্রচণ্ড ভয় তার ওপর ভর করে চারদিক লক্ষ্য করতে করতে চাপা গলায় এবার সে বলে, 'ভাগ যাও, ইধরিসে আভ্ভি ভাগ যাও! বজরঙ্গী দেখেগা তো জান চলা যায়েগা—ভাগো—'

'একলা ভাগার জন্যে আমি ফিরে আসিনি রাম ভেইয়া।'

'তবে কি মরবার জন্যে এসেছ? জানো কাল রাতে তুমি চলে যাবার পর মিশিরজির লোকেরা জঙ্গল কাটানিদের হোঁশিয়ার করে দিয়ে গেছে, কেউ ভাগার মতলব করলে খতম করে দেবে।'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে ধনপত। এরকমই সে আন্দাজ করেছিল।

রামবনবাস থামে নি। সে একটানা বলে যায়, 'মিশিরজি আর বজরঙ্গী বলেছে তোমাকে ধরতে পারলে মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে। তোমার এখানে আসা ঠিক হয় নি।'

এখানে আসাটা কতখানি বিপজ্জনক এবং এর মধ্যে কতটা ঝুঁকি রয়েছে ধনপত তা জানে। ঢোক গিলে সে বলে, 'আমি সব জানি ভেইয়া। লকেন—'

'লেকেন কা?'

রামবনবাস খানিকটা ঝুঁকে শুধোয়, 'চাঁদিয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছ?'

দেখা যাচ্ছে, চাঁদিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী, রামবনবাস তা

জানে। হয়ত এখানকার সবাই সেটা আন্দাজ করেছে। বিশেষ করে কাল রাতে যখন পালাতে গিয়ে চাঁদিয়া ধরা পড়ে যায়, তারপরই ব্যাপারটা হয়ত ব্যাপকভাবে চাউর হয়ে থাকবে।

মুখ নামিয়ে ধনপত বলে, 'একগো বাত পুছেগা ভেইয়া?'

'হুঁ, হাঁ—'

'কাল আমি চলে যাবার পর চাঁদিয়াকে ওরা মেরেছিল?'

'নহী, বিলকুল নহী। তব্—'

চাঁদিয়াকে যে বজরঙ্গীরা মেরে শেষ করে দেওয়া দূরের কথা, তার গায়ে আঙুলের টোকাটা পর্যন্ত দ্যায় নি, এতেই উৎকণ্ঠা অনেকখানি কেটে যায় ধনপতের। অবশ্য কিছুক্ষণ আগে পলকের জন্য চাঁদিয়াকে দেখেছে সে। মেয়েটার গায়ে মারধরের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে নি। সে বলে, 'তব্ কা?'

রামবনবাস বলে, 'ওকে অন্য সবার থেকে বেশি করে হোশিয়ারি দিয়েছে, আর দিনরাত ওর ওপর নজর রাখছে বজরঙ্গীর লোকেরা।'

আস্তে আস্তে ফের মুখ তোলে ধনপত। বলে, 'মেয়েটা বহোত দুখী। ওদের গাঁওয়ের বড়ে সরকারের লোকেরা ওকে মেরে জখম করে নদীতে ফেলে দিয়েছিল। মরেই যেত, লেকেন ভাগোয়ান রামজীকা কিরপা, ও জানে এখনও বেঁচে আছে।' সহানুভূতিতে ধনপতের গলার স্বর আর্দ্র শোনায়। চাঁদিয়াকে মারের কথাটাই শুধু বলে সে। কিন্তু তার ইজ্জৎ যে ধ্বংস করা হয়েছে, সে যে ধর্ষিতা সেটা আর বলে না।

কেন চাঁদিয়াকে খুন করতে চাওয়া হয়েছিল, কোন গাঁওয়ে তাদের তাদের বাড়ি—এসব নিয়ে কোন প্রশ্নই করে না রামবনবাস। আস্তে আস্তে শুধু মাথা নাড়ে। মুখচোখ দেখে বোঝা যায়, চাঁদিয়ার ওপর এই ভয়াবহ অত্যাচারের কথায় সে খুবই দুঃখিত।

আচমকা রামবনবাসের দুটো হাত জড়িয়ে ধরে ধনপত বলে, 'একটা উপকার করবে ভেইয়া?'

'কা?'

'চাঁদিয়াকে আমার খবরটা দিয়ে বলবে আমি এই জঙ্গলে তার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি।' বলে, তৎক্ষণাৎ চাপা গলায় হুঁশিয়ারিও দেয়, 'দেখো, কেউ যেন শুনতে না পায়।'

রামবনবাস বলে, 'ঠিক হ্যায়, লেকেন—'

'কা ?'

'আন্ধেরা হয়ে আসছে, এই জঙ্গলে একেলা থাকা ঠিক না। খতারনাক জানবর রয়েছে এখানে।'

'তবে কোথায় থাকব ? বজরঙ্গীর পেহারাদাররা আমাকে দেখলে বিলকুল খতম করে ফেলবে।'

রামবনবাসকে চিন্তিত দেখায়। জঙ্গলে না থেকে ধনপত যদি ফাঁকা জায়গায় যায়, ধরা পড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা। কিছুক্ষণ ভেবে সে বলে, 'এক কাম কর—'

'কা ?'

'ওই জমিনে গিয়ে পেঁড়গুলোর পেছনে দাঁড়াও, আমি গিয়ে চাঁদিয়াকে খবর দিচ্ছি।' বলে দূরে মাঠের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয় রামবনবাস।

জঙ্গলের পুব দিকে ধানকাটা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে অনেকগুলো ট্যারাবাঁকা চেহারায় সীসম গাছ গা-জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। ওগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে বজরঙ্গীরা দেখতে পাবে না। অন্তত যে ছোকরা কাল রাতে পালিয়ে গেছে সে যে আজই বিকেলে আবার এখানে হানা দেবার দুঃসাহস দেখাবে, এটা নিশ্চয়ই বজরঙ্গী বা মিশিরজির লোকেরা ভাববে না। মাঠের মাঝখানে সীসম গাছের পেছনে তার দাঁড়িয়ে থাকার ব্যাপারটা ওদের মাথাতেই আসবে না।

ধনপত বলে, 'ঠিক হ্যায়। আমি ওখানেই যাচ্ছি।'

রামবনবাস বলে, 'একগো বাত —'

'কা ?'

'তুমি কি চাঁদিয়াকে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছ ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে ধনপত। তারপর চোখ নামিয়ে আস্তে

করে বলে, 'হাঁ ভেইয়া, লড়কী বহোত দুখী।'

'বহোত দুখী' কথাটা আগে আরো একবার বলেছে ধনপত। এই কথাতেই রামবনবাস টের পেয়ে যায়, চাঁদিয়ার জন্য ধনপতের বুকের ভেতর টানটা ঠিক কোথায় এবং কী ধরনের। এ নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করে না সে। শুধু বলে, 'জঙ্গলের ভেতর দিয়ে দিয়ে জমিনের দিকে চলে যাও। হোঁশিয়ার। আমি এদিক দিয়ে যাচ্ছি।'

রামবনবাস সোজা মজুরদের ঘরগুলোর দিকে চলে যায়। আর ধনপত অনেকটা ঘুর পথে, জঙ্গলের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে, সতর্ক পশুর মতো স্নায়ু টান টান করে একসময় মাঠের মাঝখানে সেই সাসম গাছগুলোর পেছনে গিয়ে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে থাকে। ততক্ষণে ঝপ করে শীতের সন্ধ্যে নেমে এসেছে।



কতক্ষণ ধনপত দাঁড়িয়ে আছে, খেয়াল নেই। পৃথিবীর এই অংশে সন্ধ্যের পর সময় অনড় হয়ে থাকে। সমস্ত চরাচর জুড়ে হিম নামছে। কুয়াশা ফুঁড়ে ফুঁড়ে হাজার হাজার জোনাকি অনবরত আলোর ফোঁড় তুলে যাচ্ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এবং বাড়িয়া পোকা তার চামড়ায় ক্রমাগত ছুঁচ ফুটিয়ে চলেছে। সাসম গাছের ডালে রাতজাগা কাম্মার পাখিরা থেকে থেকে উৎকট ভৌতিক গলায় চেঁচিয়ে উঠছে।

কোনদিকে লক্ষ্য নেই ধনপতের। চোখের পাতা টান করে সে পিপরিয়া সাইট অফিসের দিকে তাকিয়ে আছে। ঘন কুয়াশা এবং হিমের ভেতর দু-একটা ঝাপসা আলোর ফুটকি চোখে পড়ছে অর্থাৎ ওখানে এখনও কেউ ঘুমিয়ে পড়ে নি।

মাথার ওপর খোলা আকাশ থেকে নেমে আসছে মারাত্মক হিম। পায়ের তলাতেও মাটি ফুঁড়ে উঠে আসছে পৃথিবীর আদিম দুঃসহ শীতলতা। পৌষের হিংস্র বাতাস উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে এলোপাথাড়ি ঘোড়া ছুটিয়ে যাচ্ছে। এভাবে, শীতের হিমবর্ষা এই রাত্তিরে হা হা ফাঁকা মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। অসহ্য ঠাণ্ডায় ধনপতের কান ঝিঁ ঝিঁ করতে থাকে। সে টের পায় সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে যাবে। তবু প্রচণ্ড মনের জোরে সে অপেক্ষা করতে থাকে।

রামবনবাস নিশ্চয়ই চাঁদিয়াকে খবর দিয়েছে। সবাই ঘুমিয়ে না

পড়লে মেয়েটা আসে কী করে? যেভাবে কড়া পাহারাদারি চলছে তাতে বললেই ত আর হুট করে চলে আসা যায় না।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পরও কিন্তু চাঁদিয়া এল না। ওদিকে জঙ্গল-কাটানিদের ব্যারাকে আলো নিভে গেছে। ধনপত স্থির করে ফেলল, আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। চাঁদিয়া কখন আসবে, আদৌ আসতে পারবে কিনা, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এদিকে চরাচর জুড়ে ঘন হয়ে যে হিম নামছে তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে অবধারিত মৃত্যু। এখান থেকে চলে যাবার আগে শেষবার সে চেষ্টা করে দেখবে, চাঁদিয়াকে মিশিরজিদের ফাঁদ থেকে বের করে আনতে পারে কিনা।

অসীম দুঃসাহসে পায়ে পায়ে ব্যারাকটার দিকে এগিয়ে যায় ধনপত। যদিও হিম এবং অন্ধকারে তাকে দেখে ফেলার সম্ভাবনা খুবই কম তবু অত্যন্ত সতর্ক ভঙ্গিতে সে পা ফেলতে থাকে।

ব্যারাকের কাছাকাছি এসে তার চোখে পড়ে ঘরগুলোর সামনে চার পাঁচটা 'ঘুর' জ্বলছে। খতারনাক জানোয়াররা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে যাতে এখানে হানা দিতে না পারে, সেই জন্যই এই আগুনের ব্যবস্থা।

ব্যারকটা এখন একেবারে নিঝুম। খুব সম্ভব সারাদিন জঙ্গল কাটার মতো 'গতরচূরণ' খাটুনির পর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধনপত ঘাড় নীচু করে সরীসৃপের মতো প্রায় বুকে হেঁটে আরো এগুতে থাকে।

খানিকটা যাবার পর সে এবার ভানচাঁদের ঘরটা দেখতে পায়। দু-এক দিনের আলাপে লোকটাকে বেশ ভাল লেগেছিল। ভানচাঁদ বলেছিল দশ বিশ রোজ তালিম দিয়ে সে তাকে নৌটঙ্কীর আসরে নামিয়ে দেবে। সে নাকি এমনই ওস্তাদ যে কৌয়ার গলায় কোয়েলের 'বোল' তুলে দিতে পারে।

ভানচাঁদের ঘর থেকে কথাবার্তার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে। ওরা তা হলে এখনও ঘুমোয় নি। ধনপত একবার ভাবল, ওদের ডাকবে কিনা। পরক্ষণেই তার মনে হয়, এই রাত্তিরে আচমকা তাকে দেখলে ভানচাঁদ হৈ চৈ বাধিয়ে দিতে পারে। সেটা তার পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠবে।

সামনের দিকে যাওয়া বিপজ্জনক, তাই ঘরগুলোর পেছন দিয়ে ধনপত এগুতে থাকে। ভানচাঁদের ঘরের পর রামদেওরার ঘর। তারপর একে একে জৌহরলাল জগদেও ঘমণ্ডি ধুম্মিরাম, এমনি অনেকের ঘর পেরিয়ে রামবনবাসের ঘরের পেছনে এসে দাঁড়ায়। পাঁচ ইঞ্চি ইটের পাতলা দেয়ালে কান রেখে বুঝতে চেষ্টা করে সে ঘরে আছে কিনা। কিন্তু ভেতরে কোন রকম সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না। রামবনবাস কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর ধনপত খুব আস্তে করে ডাকে, 'ভেইয়া—'

রামবনবাসের সাড়া মেলে না।

ধনপত গলার স্বর আরেকটু উঁচুতে তোলে, 'ভেইয়া, হো ভেইয়া—'

এবারও রামবনবাসের উত্তর নেই।

ধনপত ডান পাশে ঘরের সামনের দিকে তাকায়। তক্ষুণি হৃৎপিণ্ডের ওঠানামা থমকে যায়। পাহারাদার টহলরাম কাঁধে বন্দুক ফেলে ঠিকাদারের অফিসের দিক থেকে এধারে আসছে। তার পেছনে রামধনিয়া এবং আরো ক'টা লোক। যদিও হিংস্র জানোয়ারদের জন্য বন্দুক নিয়ে এই টহলদারির ব্যবস্থা, আসল উদ্দেশ্যটা কিন্তু অন্যরকম। রাতের অন্ধকারে জঙ্গলকাটানিরা যাতে ভাগতে না পারে সেই কারণে তাদের চোখে চোখে রাখার নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করেছে মিশিরজি।

দ্রুত মুখটা রামবনবাসের ঘরের পেছন দিকের দেয়ালের আড়ালে টেনে নেয় ধনপত।

রামবনবাসের ঘরটার পর আরো দশ বারোটা ঘর পেরুলে পাশাপাশি চাঁদিয়া এবং তার ঘর। কিন্তু সেদিকে এখন আর যাওয়া যাবে না। টহলরামের দলটা ওধারেই গেছে। তাকে দেখামাত্র নির্ঘাত ওরা গুলি চালিয়ে দেবে।

দম বন্ধ করে ধনপত দাঁড়িয়ে থাকে। টহলরামরা ওধার থেকে ফিরে সাইট অফিসের দিকে গেলে সে একবার চাঁদিয়ার ঘরে যেতে চেষ্টা করবে কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও ওরা ফেরে না।

এদিকে মশা আর বাড়িয়া পোকার অনবরত কামড়ে চামড়া জ্বলে

যাচ্ছে। ধনপত কী করবে যখন ভেবে পাচ্ছে না সেই সময় টহলরামরা ফিরে এসে রামবনবাসের ঘরের সামনাসামনি 'ঘুর'টার চারপাশ ঘিরে গোল হয়ে বসে। ঝাপসা অন্ধকারেও ধনপত দেখতে পায় ওরা পোড়া মাটির কল্কেতে গাঁজা ঠাসছে। পৌষের শীতে গা গরম রাখার জন্য এমন অব্যর্থ দাওয়াই আর নেই

ধনপতের প্রাণে যেটুকু আশাও বা ছিল সব মুহূর্তে চুরমার হয়ে যায়। টহলরামদের গাঁজার আসর সহজে ভাঙবে বলে মনে হয় না। তার অর্থ সামনের দিক দিয়ে চাঁদিয়ার ঘরের দিকে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। যেখানে নিশ্চিত মৃত্যু সেখানে পা বাড়াবার মতো হঠকারিতা সে করতে পারে না।

গভীর নৈরাশ্যে বুক ভরে যায় ধনপতের। অকারণে এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে। এলোমেলো পা ফেলে আবার সে ফাঁকা ধানক্ষেতের দিকে এগিয়ে যায় মনে মনে বলে, 'হো রামজি, হো কিষণজি হামনি তো কোনো কিয়া। লেকেন সব কী করে।' সে নিজেকেই যেন বোঝাতে চায়, হে রামজি, হে কিষণজি, চাঁদিয়াকে উদ্ধার করবার জন্য কম চেষ্টা করিনি। আর কী করতে পারি আমি! এখন সবই তোমার মর্জি

ধানক্ষেতে পা দিতে না দিতেই ধনপতের চোখে পড়ে উল্টোদিক থেকে আলের ওপর দিয়ে কে যেন আসছে একবার ধনপত ভাবে মাঠে নেমে দৌড় লাগায়। কিন্তু তার আগেই লোকটা খুব কাছে এসে পড়েছে। তার সারা শরীর, পা থেকে মাথা পর্যন্ত ধুসো কম্বলে মোড়া। শুধু নাকের ডগা এবং চোখ দুটো বেরিয়ে আছে. দেখামাত্রই চেনা যায়—লোকটা রামবনবাস।

ধনপত বিমূঢ়ের মতো বলে, 'রাম ভেইয়া. তুম!'

রামবনবাস বলে, 'তোমার খোঁজে মাঠে গিয়েছিলাম। বহোত ঢুঁড়া থা, লেকেন কিধরভি তুমনি নহী। তোমাকে না পেয়ে এখন ফিরে যাচ্ছি। কিধর গিয়া থা তুমনি?'

ধনপত জানায়, বেঁটে বেঁটে সাসম গাছগুলোর তলায় অনেকক্ষণ

দাঁড়িয়ে থাকার পরও যখন রামবনবাস এল না তখন খুবই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। রামবনবাস ভেইয়া কি চাঁদিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে কোনরকম বিপদে পড়ে গেল? সে তাই দু'জনেরই খোঁজে 'বারিকে' গিয়েছিল। কিন্তু কারো সঙ্গেই দেখা হয় নি।

ধনপত আঁতকে ওঠে, বলে, এভাবে 'বারিকে' তার যাওয়া উচিত হয় নি। এরকম হঠকারিতার ফল ভয়াবহ হতে পারত। রামচন্দ্‌জির কৃপায় যে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসতে পেরেছে, এই ঢের।

ধনপত কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। রামবনবাস যা বলেছে তার প্রতিটি অক্ষর সত্যি। একসময় বলে, 'চাঁদিয়ার কী হল?'

'কিছুই করা গেল না' জোরে জোরে, গভীর হতাশায় মাথা নাড়ে রামবনবাস, 'বহোত্ কোসিস কিয়া। লেকেন—'

'লেকেন কী?' গলার স্বরটা ভাঙা শোনায় ধনপতের।

'বজরঙ্গী ওর ওপর এমন পেহেরাদারি চালাচ্ছে যে ভাল করে কথা পর্যন্ত বলতে পারি নি। জঙ্গল থেকে ফেরার পর একবার কুয়ার পাড়ে দেখা হয়েছিল। তোমার কথা ওকে বললাম। শুনে কাঁদতে লাগল। বলল, 'ওকে চলে যেতে বল এখান থেকে। আমার আর বেরুনো হবে না।' আর বলল, যদি পার, তুমি যেন দধিপুরায় চাঁদিয়ার মা-বাপের কাছে ওর খবরটা দিও। ওর বাপের নাম দুধনাথ।' রামবনবাস বলতে থাকে, 'আমরা যখন কথা বলছি দশ হাতে তফাতে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে গিধের মতো তাকিয়ে ছিল বজরঙ্গী। সে আচানক চিল্লিয়ে উঠল, 'কী গুজুর গুজুর করছিস রে ভূচ্চর? পানিয়া লেকে আভ্ভি ভাগ যা।' কী আর করি, চাঁদিয়াকে বললাম, রাত্তিরে ওর ঘরে যাব। যদি সুবিধা হয় ত ওকে নিয়ে ক্ষেতিতে তোমার কাছে পৌঁছে দেব। লেকেন—'

রুদ্ধশ্বাসে ধনপত জিজ্ঞেস করে, 'কী?'

'শুনে কী হবে? মনমে বহোত কষ্ট্ হোগা।'

'হোক, তুমি বল।'

অনেকটা সময় চুপ করে থাকে রামবনবাস। তারপর বলে, 'কিছুক্ষণ

আগে বারিকের লোকজন ঘুমিয়ে পড়লে চাঁদিয়ার কাছে গিয়েছিলাম লেকেন ঘরের দরজা বন্ধ। গলার আওয়াজে মালুম হল ভেতরে বজরঙ্গী রয়েছে। গিধটা বলছিল, রাত্তিরে ওর ঘরেই থাকবে। আমি আর দাঁড়াইনি, সিধা তোমাকে খবর দিতে চলে এসেছি।'

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ধনপত। মাত্র কায়ক দিনের চেনা একটি মেয়ের জন্য তার বুকের ভেতরটা ভেঙেচুরে তোলপাড় হয়ে যেতে থাকে।

রামবনবাস ধনপতের কাঁধে একটা হাত রাখে। বলে, 'তুমি এখান থেকে চলে যাও ধনপত। চাঁদিয়াকে তুমি পাবে না।' একটু থেমে ফের বলে, 'লড়কীটার জন্যে বহোত কষ্ট হয়। লেকেন কা করে? গভীর সহানুভূতি এবং দুঃখে বুড়ো বৃক্ষপ্রেমিক মানুষটির গলা ভারী হয়ে আসে।

'নহী—' আচমকা চেঁচিয়ে ওঠে ধনপত।

রামবনবাস অবাক। ধনপতের কাঁধ থেকে দ্রুত হাত নামিয়ে বলে 'কা হুয়া?'

'নহী যায়েগা ইধরিসে।' গলার স্বর আরো চড়িয়ে দেয় ধনপত, 'বজরঙ্গীকা শির তোড়েগা পহেলে, তারপর চাঁদিয়াকে ছিনিয়ে নিয়ে যাব। এখনই যাচ্ছি চাঁদিয়ার ঘরে। শালে ভূচ্চরকা ছৌয়া।'

শেষের গালাগালটা যে বজরঙ্গীর উদ্দেশে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। হঠাৎ শান্ত নিরীহ ভীরু এই যুবকটিকে ক্ষেপে উঠতে দেখে ঘাবড়ে যায় রামবনবাস। ছোকরার মাথাটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি? সে জানে এই মুহূর্তে চাঁদিয়ার ঘরে ধনপত গেলে তার পরিণতি কী হতে পারে। সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'কা, আপনা মৌত ডেকে আনতে চাইছ?'

ধনপত কোন কথাই যেন শুনতে পাচ্ছে না। হিতাহিত জ্ঞান শূন্যের মত। উদভ্রান্ত ভঙ্গিতে সে চাঁদিয়ার ঘরের দিকে পা বাড়ায় চোখমুখ দেখে মনে হয়, একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

দ্রুত হাত বাড়িয়ে ধনপতের কাঁধ চেপে ধরে রামবনবাস। চা ভয়ার্ত গলায় বলে, 'মাত যাও, মাত যাও।'

রামবনবাসের কণ্ঠস্বরে এমন কিছু আছে যাতে থমকে দাঁড়িয়ে যায় ধনপত। বুঝতে পারে নৈরাশ্যের শেষ প্রান্তে পৌঁছে সে হঠকারিতা করতে যাচ্ছিল। হঠাৎ দু হাতে মুখ ঢেকে ভাঙা গলায় বলে ওঠে, 'অব্ কা করে হামনি?'

তার কাতর গোঙানির মতো স্বর রামবনবাসের হৃৎপিণ্ড তোলপাড় করে দিতে থাকে। কিছুক্ষণ কি ভাবে সে, তারপর বলে, 'আজ রাতটা কোথাও থাকতে পারবে?'

'কায়?'

'কাল মওকা বুঝে চাঁদিয়ার সঙ্গে আরেক বার কথা বলব। যদি কিছু ব্যওস্থা করতে পারি।'

'এত্তে জাড়। এই ফাঁকা জমিনে রাত কাটাতে হলে বিলকুল মরে ফৌত হয়ে যাব।'

রামবনবাস বলে, 'সেদিন টিসন থেকে গৈয়া গাড়িতে আসার সময় একটা ছোটা দেহাত দেখেছিলাম, মনে আছে?'

ধনপতের আবছাভাবে মনে পড়ে যায়। পিপরিয়া সাইট অফিস এবং রেল স্টেশনের মাঝামাঝি একটা ছোট হতচ্ছাড়া চেহারার গাঁ সেদিন চোখে পড়েছিল ঠিকই। সে আস্তে ঘাড় হেলায়।

রামবনবাস বলে, 'আজ রাতটা ওহী গাঁওমে থাকো গিয়ে। কাল সন্ধ্যের সময় আবার ওখানে পেঁড়গুলোর তলায় এসে দাঁড়িও। আমি খবর নিয়ে আসব।'

এ ছাড়া আর কী-ই বা করা যায়! ধনপত বিমর্ষ মুখে দূরে অচেনা গ্রামের দিকে পা বাড়ায়, আর রামবনবাস চলে যায় মজুর ব্যারাকে।

মাঝরাতে অজানা ঘুমন্ত গাঁয়ে পৌঁছে সামনে যে কোমর-বাঁকা টিনের চালের বাড়িটা পায়, তার দরজায় ধাক্কা দিয়ে দিয়ে লোকজনদের ঘুম ভাঙায় ধনপত। অফুরন্ত জীবনীশক্তির জোরেই হয়ত পৌষের প্রচণ্ড হিমে এতটা রাস্তা এসেও সে একেবারে মরে যায় নি। কোন রকমে বলতে পারে, আজকের রাতটা সে আশ্রয় চায়। এ সব

বলতে বলতেই ঘাড়মুখ গুঁজে পড়ে যায়।

বাড়ির লোকজনেরা গরীব হলেও অমানুষ নয়। তাড়াতাড়ি তাকে তুলে একটা দড়ির চৌপায়া শুইয়ে দেয়। মেয়েরা তক্ষুণি আগুন জেলে সেঁক দিয়ে দিয়ে তার জমে-যাওয়া শীতল শরীরে উত্তাপ ফিরিয়ে আনে। রাতে খাওয়ার পর যে বাড়তি চাপাটি বেঁচে ছিল, যত্ন করে ধনপতকে খাওয়ায়। এমন কি ঘুমোবার জন্য একটা ভারী কম্বল পর্যন্ত দেয়।

ধনপত ভেবেছিল, সকালে উঠেই চলে যাবে কিন্তু লোকগুলো এত ভাল এবং হৃদয়বান যে যেতে দেয় না। দুপুরে খাইয়ে দাইয়ে তবে ছাড়ে। দুনিয়ায় এখনও ভাল মানুষ কিছু আছে। কৃতজ্ঞ ধনপতের চোখে গাঢ় আবেগে জল এসে যায়।

সূর্য পশ্চিমা আকাশে হেলে গেলে ধনপত বিদায় নিয়ে আবার পিপরিয়া সিমেন্ট কোম্পানির সাইট অফিসের দিকে হাঁটতে থাকে। যতই এগোয় উদ্বেগে বুক কাঁপতে থাকে। রামবনবাস আজ কী খবর নিয়ে আসবে, কে জানে।

এক সময় সন্ধ্যে নামার মুখে মুখে ফাঁকা মাঠে সেই সীসম গাছ গুলোর নিচে পৌঁছে যায় ধনপত। বেশিক্ষণ অবশ্য দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। কিছুক্ষণ পরেই আজকের মতো জঙ্গল কাটা শেষ করে রামবনবাস এসে পড়ে। রুদ্ধশ্বাসে ধনপত শুধোয়, 'কী হল ভেইয়া?'

আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে রামবনবাস, 'কিছুই করতে পারলাম না। বজরঙ্গী আর তার আদমীরা চাঁদিয়াকে দিনরাত নজরে নজরে রাখছে। কেউ ওর সঙ্গে দাঁড়িয়ে একটার বেশি দুটো কথা বললে ভাগিয়ে দিচ্ছে।'

অস্পষ্ট গলায় কিছু বলে ধনপত কিন্তু একটা কথাও বোঝা যায় না।

রামবনবাস বলে, 'তবু জঙ্গলে চুপকে চুপকে চাঁদিয়ার সঙ্গে কথা বলেছি। ও বলল—'

'কী?'

'কাল যা বলেছিল তা-ই।' বলে, একটু থামে রামবনবাস। তারপর বিষণ্ণ গলায় শুরু করে, 'তুমি চলে যাও। চাঁদিয়াকে ভূচ্চরের

ছোঁয়াদের হাত থেকে বার করে আনা যাবে না।'

এবার বিমূঢ়ের মতো তাকিয়ে থাকে ধনপত। ঝাপসা অন্ধকারে তার মুখচোখ দেখে মনে হয়, তার বুকের ভেতরটা ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে।

রামবনবাস থামে নি, সে বলতে থাকে, 'একগো বাত ধনপত—'

'কা ?'

'চাঁদিয়া আজও বলছিল তুমি যদি থোড়েসে কষ্ট করে একবার ওদের গাঁও দধিপুরায় যাও—'

'যাব ?'

'চাঁদিয়া যে পিপরিয়ায় জঙ্গল কাটাই করছে সেই খবরটা ওর বাপ মাকে দিলে বহোত উপকার হয়। ওর মা-বাপ জানুক, তাদের লড়কী এখনও জিন্দা আছে।' রামবনবাস বলতে থাকে. 'দধিপুরা গাঁও-য়ের অচ্ছুৎটুলিতে ওদের ঘর।'

আবছা কাঁপা গলায় ধনপত বলে, 'ঠিক হ্যায়।' তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে আলের ওপর দিয়ে এলোমেলো পায়ে দিগন্তের দিকে এগিয়ে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যে বিশাল প্রান্তরের গাঢ় হিম এবং অন্ধকার তার শরীরটাকে দ্রুত গ্রাস করে ফেলে।

রামবনবাস তার পরও বেশ খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। ফিস ফিসিয়ে কাঁপা গলায় বলতে থাকে, 'হো রামজি, হো কিষণজি. তেরে কিরপা।'



চাঁদিয়া যখন বলেছে তখন ধনপতকে দধিপুরায় যেতেই হবে। তার মা-বাপ অন্তত এটুকু জেনে সান্ত্বনা পাক, তাদের মেয়ে এখনও পৃথিবীর এক কোণে বেঁচে আছে। যদিও দুধনাথ হয়ত পিপরিয়ার ঠিকাদারদের ফাঁদ থেকে কোনদিনই চাঁদিয়াকে উদ্ধার করে আনতে পারবে না তবু সে যে মরে যায় নি, মা-বাপের কাছে এটা খুবই বড় ব্যাপার। একটু ভীরু আশা তাদের বুকে ধুকপুক করতে থাকবে, হয়ত কোন একদিন—দো সাল, পাঁচ সাল কিংবা দশ সাল পরে নিজেদের খোয়ানো সন্তানকে ফিরে পাবে।

পুরো একটা দিন খানিকটা ট্রেনে এবং বাকিটা পায়ে হেঁটে শেষ পর্যন্ত ধনপত দধিপুরায় পৌঁছে যায়। একে ওকে জিজ্ঞেস করে যখন সে অচ্ছুৎটুলিতে দুধনাথ দোসাদের ভাঙাচোরা টালির ঘরে গিয়ে হাজির হয়, সূর্য পছিমা আকাশের দিকে অনেকটা নেমে গেছে। পৌষের শেষ বেলায় রোদের তাপ দ্রুত জুড়িয়ে যাচ্ছে।

আধবুড়ো কোলকুঁজো দুধনাথ এবং তার ঘরবালী কবুতরী সবে নিজেদের ক্ষেতি থেকে ফিরে এসেছে। যদিও সবে ধান উঠেছে তবু রবিফসলের জন্য এর মধ্যেই ধানের গোড়া তুলে, শুকনো মরকুটে ঘাস এবং আগাছা উপড়ে জমি তৈরি করতে শুরু করেছে দুধনাথরা। আসলে চুপচাপ হাত-পা গুটিয়ে ওরা বসে থাকতে পারে না। সারা বছরই নিজেদের ক্ষেতিতে এবং অধিকলাল চৌবের জমিতে হয় ফসল রুইছে, নয় ধান কাটছে, কিংবা আগাছা বাছছে।

ধনপত যখন বলে সে বিশেষ একটা জরুরি কাজে তাদের কাছে এসেছে তখন ঢুধনাথ এবং কবুতরী খুবই অবাক হয়ে যায়। কেননা এই সম্পূর্ণ অচেনা যুবকটির তাদের কাছে আসার উদ্দেশ্য কী হতে পারে, কেউ ভেবে পায় না।

ঝুঁকে-পড়া ঘরের বারান্দায় মুখোমুখি বসে ঢুধনাথ শুধোয়, 'তুম কিধরসে আয়া ?'

একটু দূরে টিনের নানারকম তাপ্পি-মারা দরজার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে, কিছুটা বা উদ্বিগ্ন চোখেই ধনপতকে লক্ষ্য করছে কবুতরী। ওদের তিন ছেলেমেয়ে বারান্দার আরেক ধারে বসে আছে. তাদের চোখও অজানা আগন্তুক অর্থাৎ ধনপতের দিকে।

সবাইকে দ্রুত একবার দেখে নেয় ধনপত। তারপর বলে, 'পিপরিয়া।'

মুখ চোখের প্রতিক্রিয়া দেখে মনেই হয় না, এই নামটা আগে আর কখনও ঢুধনাথরা শুনেছে। পৃথিবীর কোন প্রান্তে পিপরিয়া— সেটা দেহাত না ভারী টৌন বা হাটিয়া কিংবা বাজার কি গঞ্জ— এ সম্পর্কে তাদের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। আসলে দধিপুরাকে ঘিরে দশ বিশ মাইলের ওধারে যে বিপুল বিস্তীর্ণ জগৎ পড়ে আছে তার আদৌ কোন খবর ওরা রাখে না।

বিমূঢ়ের মতো ঢুধনাথ শুধোয়, 'পিপরিয়া কঁহা ?'

ধনপত দক্ষিণে সুদূর দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দেয়, 'উধরি—'

'কেত্তে দুর ?'

'হোগা ষাট পঁয়ষট 'মিল'।'

একটু চুপ করে থেকে ঢুধনাথ এবার শুধোয়, 'হামনিকো পাস তুমহারা কা জরুরত ?'

ধনপত সামনের দিকে ঝুঁকে, গলার স্বর অনেকটা নামিয়ে বলে, 'আমাকে চাঁদিয়া পাঠিয়েছে।'

মুহূর্তে বিজরি চমকের মতো কিছু একটা ঘটে যায়। ঢুধনাথ কবুতরী এবং সেই ছোট ছেলেমেয়ে তিনটের চোখে মুখে উৎকণ্ঠা আশা

উত্তেজনা—এমনি অনেক কিছু এক সঙ্গে ফুটে উঠতে থাকে।

তুধনাথ ধনপতের একটা হাত ধরে তীক্ষ্ণ গলায় প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'কা, কা বোলা ?'

চাঁদিয়ার কথাটা আবার বলে ধনপত।

'বেঁচে আছে চাঁদিয়া ?'

'হাঁ।'

হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে দু হাতে মুখ ঢেকে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে কবুতরী। পরক্ষণে তার শীর্ণ বুকের হাড় চিরে একটা চিৎকার বেরিয়ে আসে, 'মেরে চান্দি, মেরে চান্দি—মেরে বচ্চী—' কান্নার উচ্ছ্বাসে তার শরীর উথল পাথল হয়ে যেতে থাকে।

অন্য সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। কবুতরীর বুকের ভেতর অনেক দিনের কান্না জমাট হয়ে আটকে ছিল। এখন সেটা প্রবল স্রোতে বেরিয়ে এসেছে।

একসময় কবুতরীর দেখাদেখি বারান্দার ওধারে সেই ছেলেমেয়ে তিনটেও কাঁদতে শুরু করেছে। তুধনাথও অনবরত ঢোক গিলে কান্নার তোড় ঠেকিয়ে যাচ্ছিল। জোরে জোরে বুক ফাটিয়ে সে কাঁদছে না, তবে তার চোখও জল ভরে উঠেছে, পুরু কালচে ঠোঁট দুটো থরথর কাঁপছে। অনেকক্ষণ পর কবুতরীর উদ্দেশে সে বলে, 'রো মাত, রো মাত—'

কুবতরার কান্না তাতে থামে না। আরো তীব্র হয়ে ওঠে। তার একটানা বিলাপ পৌষের বাতাসে ছড়িয়ে গিয়ে চারদিক বিষাদে ভরে দিতে থাকে।

একটানা কাঁদার পর কবুতরী একটু শান্ত হলে তুধনাথ ধরা গলায় ধনপতকে শুধোয়, 'চৌবেজির পহেলবানরা চান্দিকে বরখা নদীতে ফেলে দিয়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম, মরেই গেছে। লেকেন ও পিপরিয়া গেল কী করে ? তোমার সঙ্গে দেখাই বা হল কী ভাবে ?'

বরখা নদীর পারে বেহুঁশ রক্তাক্ত অবস্থায় চাঁদিয়াকে পড়ে থাকতে দেখা, তারপর সেখান থেকে তুধলিগঞ্জের হাটিয়ায় যাওয়া, তুধলিগঞ্জ

থেকে আড়কাঠিদের পাল্লায় পড়ে পিপরিয়ায় পৌঁছুনো, সেখানেও টিপছাপ দিয়ে নিকৃষ্ট ভূমিদাসের মতো জীবন, তারপর পিপরিয়া থেকে ত্ব'জনে পালাতে গিয়ে চাঁদিয়ার ক্ষেতিতে পড়ে যাওয়া, এমনি যাবতীয় খবরই দিয়ে যায় ধনপত। সব বলা হয়ে গেল কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপরবিষণ্ণ গলায় আবার শুরু করে, 'পিপরিয়া থেকে তোমাদের লড়কীকে বার করে আনার জন্যে বহুত কোসিস কিয়া, লেকেন কুছ নহী হুয়া।'

ত্বধনাথ উত্তর দেয় না।

ধনপত ফের বলে, 'লড়কার খবর দিয়ে গেলাম। যদি পারো ওকে ঘরে ফিরিয়ে এনো।'

ত্বধনাথের বুকের গভীর থেকে দীর্ঘশ্বাস উঠে আসে। করুণ হতাশ মুখে সে বলে, 'তোমার মতো হট্টাকট্টা জোয়ান আদমীই তাকে আনতে পারল না। আমি কী করে পারব।'

ধনপত কী বলবে ভেবে পায় না।

ত্বধনাথ তীব্র হতাশায় এবং কষ্টে জোরে জোরে মাথা নাড়ে, 'লড়কীটার সঙ্গে এ জীওনে আর দেখা হবে না।'

দেখা হবে না কেন? থোড়সে কোসিস করো?

কথাটা আর শেষ করতে পারে না ধনপত। তার আগেই কবুতরী এবং তার সঙ্গে সেই ছেলেমেয়ে তিনটে কেঁদে ওঠে।

তাদের কান্নার মধ্যেই ত্বধনাথ বলে ওঠে, 'চান্দি যে গাঁওয়ে ফিরে আসবে তারও উপায় নেই। চৌবেজি ওকে—' এই পর্যন্ত বলেই থেমে যায়।

ত্বধনাথ চুপ করে গেলেও সে যা বলতে চায়, বুঝতে অসুবিধা হয় না ধনপতের। সে কোন উত্তর দেয় না। অধিকলাল চৌবের মতোই হুকুমদার বজরঙ্গী নামে একটা ভূচ্চরের ছোঁয়া পিপরিয়াতে আছে এবং সে-ই যে খতারনাক জানোয়ারের মতো চাঁদিয়ার শরীরটা চিবিয়ে খাচ্ছে, সে কথা আর বলতে পারে না। একটা ত্বঃখী ত্বর্বল কাতর বাপকে বাড়তি কষ্ট দিতে ইচ্ছা হয় না ধনপতের।

কিছুক্ষণ আগেও বাসি হলুদের রঙের মতো ম্যাড়মেড়ে একটু রোদ আকাশের গায়ে আটকে ছিল। হঠাৎ ঝপ করে শীতের সন্ধ্যে নেমে এল। এই সময়টার জন্য উত্তুরে বাতাস যেন ওত পেতে ছিল। অদৃশ্য খাপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে সেটা সাঁই সাঁই চাবুক হাঁকিয়ে দিগন্তের ওপর দাপিয়ে বেড়াতে লাগল।

ভুধনাথ এবার উদাস হতাশ মুখে বলে, 'দেখতে না পাই, তবু তোমার জন্যে জানতে পারলাম, লড়কীটা আমার মরে যায় নি। ভগোয়ান রামজি তোমার ভালাই করবে।'

ধনপত বলে, 'অন্ধেরা হয়ে যাচ্ছে। এবার আমি যাই।'

'নহী, নহী—' ভুধনাথ বলতে থাকে, 'ষাট পঁয়ষট 'মিল' দূর থেকে এত্তে তখলিফ করে চান্দির খবর নিয়ে এলে। এখন তোমাকে ছাড়া হবে না। আজ রাতটা আমাদের এখানে থেকে কাল যেও।'

ধনপতেরও সেই রকমই ইচ্ছা। তিনটে রাত মারাত্মক হিমে সে খুবই কষ্ট পেয়েছে। অবশ্য কাল কিছুক্ষণের জন্য পিপরিয়ার কাছে সেই গাঁওটায় যে আশ্রয় পেয়েছিল। হিমের বিরুদ্ধে যুঝবার মতো তার শারীরিক শক্তি আর বিশেষ অবশিষ্ট নেই। একটা রাতও যদি আর তাকে খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাকতে হয়, সে নির্ঘাত মরে যাবে।

ভুধনাথ বলে, 'তুমি আমাদের এত উপকার করলে, লেকেন তোমার খবরটাই ভাল করে নেওয়া হল না। তখন বলছিলে না, বরখা নদীর পারে বেহোঁশ চান্দিকে দেখেছিলে?'

বরখা নদীর আরেক ধারে ধুরুয়া গাঁ থেকে কী ভাবে এবং কোন ভয়াবহ কারণে বেরিয়ে পড়েছিল আর জমি-মালিক চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানদের তাড়া খেয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়েছিল—সব বলে যায় ধনপত। নদীর ধারে বেহুঁশ চাঁদিয়াকে দেখার পর থেকে যা যা ঘটেছিল সে সব আগেই বলেছে।

সমস্ত শোনার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে ভুধনাথ। যে কবুতরী এতক্ষণ একনাগাড়ে কাঁদছিল সে-ও থেমে গেছে, একদৃষ্টে সজল

চোখে সে ধনপতের দিকে তাকিয়ে থাকে। অচ্ছুৎটুলির শেষ মাথায় এই ভাঙাচোরা ঘরটাকে ঘিরে অদ্ভুত স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

এক সময় দুধনাথ বিমর্ষ মুখে বলে, 'তোমরা বান্ধুয়া কিষাণ ?'

'হাঁ।' আস্তে ঘাড় হেলিয়ে দেয় ধনপত।

'কেত্তে রোজ বেগার খাটছ ?'

ধনপত জানায় সেই ঠাকুরদার আমল থেকে তিন পুরুষ ধরে তারা চন্দ্রিকা সিংয়ের জমিতে পেট-ভাতায় খেটে আসছে। আরো কত দিন, কত পুরুষ খাটতে হবে, কে জানে।

দুধনাথ বলে, 'বহোত দুখকা বাত।'

ধনপত উত্তর দেয় না।

দুধনাথ কি ভেবে এবার বলে, 'তোমাদের গাঁওয়ের কথা যা বললে তাতে সেখানে ত আর ফিরতে পারবে না।'

'নহী। ওখানে গেলে চন্দ্রিকা সিংয়ের পহেলবানেরা আমাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে।'

'তা হলে কী করবে ? কোথায় যাবে ঠিক করেছ ?'

'নহী।'

রাত্তিরটা দধিপুরা গাঁয়ে চাঁদিয়াদের ঘরে কাটিয়ে পর দিন সকালে বেরিয়ে পড়ে ধনপত।



দুধনাথদের কাছ থেকে চলে আসার পর কয়েকটা দিন কেটে যায়। এর মধ্যে যে ক'টা টাকা সঙ্গে ছিল সব শেষ হয়ে গেছে। তারপর ভিখমাঙোয়াদের মতো লোকের কাছে হাত পেতে আরো তিন চার দিন কাটে। কিন্তু যে মানুষ স্বাধীনতার খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে তার পক্ষে এ ভাবে পরের করুণার ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা খুবই অসম্মানজনক।

কয়েকটা দিন সে হাটে গঞ্জে মাল বয়ে কাটিয়ে দেয় কিন্তু তাতে পেটটা ঠিকমতো চলে না। পরনে যে 'ফুল' প্যান্ট আর জামা টামা দিলে তা ছাড়া আর কিছুই সে পিপরিয়া থেকে আনতে পারে নি। না বাড়তি জামাকাপড়, না বাসনকোসন, না একটা কম্বল। সারাদিন তবু একরকম কেটে যায় কিন্তু রাত্তিরগুলো আর পার হতে চায় না। পিপরিয়ার কাছের সেই গাঁয়ের লোকজন বা দুধনাথের মতো মানুষ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই। কেউ রাত্তিরে তাকে ঘরের ভেতর আশ্রয় দিতে চায় না। তাকে পড়ে থাকতে হয় হাটের শূন্য চালায় বা কারো বাড়ির উদোম বারান্দায়। শীতের দুঃসহ হিম আর উত্তুরে হাওয়া তার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ক্রমশ তার শরীর ভেঙেচুরে কমজোরি হয়ে যেতে থাকে। স্বাধীনতার দাম যোগাড় করতে একদিন বেরিয়েছিল সে। শরীরই যদি শেষ হয়ে যায় মুক্তির মূল্য জোটাবে কোত্থেকে?

একদিন মাল বওয়ার কাজকর্ম না পেয়ে লক্ষ্যহীনের মতো এক

গাঁয়ের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল ধনপত। হঠাৎ একটা বড় কড়াইয়া গাছের তালায় ভিড় চোখে পড়ে। একটা হট্টাকট্টা চেহারার লোক চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কী যেন বলছে আর গাঁয়ের মানুষেরা তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হাঁ করে সব শুনছে। পায়ে পায়ে ধনপত সেদিকে এগিয়ে যায়।

লোকটা তখন বলছে, 'আমার সঙ্গে তোমরা আসাম চল। বেত কাটাইয়ের কাম পাবে। রোজ মজুরি পন্দর রুপাইয়া—'

ধনপতের একটা কাজ দরকার। নিয়মিত রোজগার করতে না পারলে তাকে 'ভুখা' মরতে হবে। রোজ পনের টাকা মজুরির কথায় সে অবাক হয়ে যায়। তার কাছে এত টাকা স্বপ্নের মতোই অবিশ্বাস্য।

ধনপত নিজের অজান্তে শুধোয়, 'পন্দর রুপাইয়া মজুরি মিলবে! সচ?'

লোকটা বলে ওঠে, 'হাঁ হাঁ, সচ।' তারপর নিজের বুকে আঙুল ঠেকিয়ে গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়ায়, 'এই নৌটেয়ারলালের গলা দিয়ে কখনও ঝুট বেরোয় না। কভি নহী।'

আসাম জায়গাটা কোথায়, ধনপতের বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। সে শুধোয়, 'আসাম ইঁহাসে কেত্তে দূর?'

'নজদিগ। কাটিহারের নাম জানো?'

'শুনা হ্যায়।'

'তার কাছে। এখান থেকে টিরেনে কাটিহার। কাটিহারসে টিরেনমে লগভগ দশ বিশ 'মিল' হোগা।'

'আমি যাব বেত কাটাইয়ের কাজে।'

'বহোত খুশকা বাত।'

শুধু ধনপতই না, এই অচেনা গাঁয়ের আরো পঁচিশ তিরিশ জনও আসাম যেতে রাজি হয় এবং পরদিন নৌটেয়ারলাল এদের সঙ্গে করে কাটিহার চলে যায়।

সন্ধ্যেবেলা কাটিহার পৌঁছে দেখা যায়, আরো শ পাঁচেক লোক

নোটেয়ারের জন্য স্টেশনের বিশাল প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জানা গেল, এরাও বেত কাটাইয়ের কাজে আসাম চলেছে।

মাঝরাতে ধনপতদের ট্রেনে তোলা হল। গাড়ি ছাড়ার পর নৌটেয়ারলাল এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গরা ছাপানো কাগজ বার করে সবার অঙ্গুঠার ছাপ নিতে থাকে।

দেখতে দেখতে চমকে ওঠে ধনপত। ঠিক এইভাবেই মিশিরজিও ছাপ নিয়েছিল। তার আগে চন্দ্রিকা সিংয়ের বাপ তার ঠাকুরদার টিপছাপ নিয়েছে।

ব্যাপারটা তার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। যেখানে যাচ্ছে সেখান থেকে পালাবার উপায় নেই। আঙুলের একটি ছাপে সে আবার দায়বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। মনে মনে একেবারে ভেঙে পড়ে ধনপত। চোখেমুখে গাঢ় বিষাদ ফুটে ওঠে।

কোথায় কতদূরে তাদের ধুরুয়া গাঁয়ে পড়ে রইল মা বাবা ভাই বোনেরা। চাঁদিয়া নামের কাম্য নারীটি পিপরিয়ার জঙ্গলে আটকে রইল, বজরঙ্গী গিধের মতো তাকে আগলে আছে। সব প্রিয়জনকে পেছনে ফেলে সে কোথায় ক্রমশ দূরে, আরো দূরে, বহুদূরে চলে যাচ্ছে।

একদিন স্বাধীনতার দাম যোগাড় করতে ধুরুয়া গাঁ থেকে বেরিয়ে পড়েছিল ধনপত। তখন কি জানতো গোটা পৃথিবী জুড়ে ফাঁদ পাতা আছে?

তাদের মতো জনমদাসদের জন্য কোথাও মুক্তি নেই।
